সাঁওতালসমাজ-সমীক্ষা

ধনপতি বাগ

সমতট প্রকাশনী
৫/১ বি দেশপ্রিয় পার্ক ইস্ট
কলকাতা ৭০০ ০২৯

প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

প্রকাশক শ্রীঅর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত
সমতট প্রকাশনী

প্রচ্ছদশিল্পী শ্রীসনৎ কর

মুদ্রক
শ্রীমুকুল মণ্ডল
সুধা-শ্রী মুদ্রণ ।
বোলপুর

নিবেদন

সাঁওতাল-সমাজ-সমীক্ষা' প্রণয়নে আমি যে নীতিকে সামনে রেখে এগিয়েছি সেটা আগেই বলছি। সমাজ-দেহকে জানাব তাগিদ আমার তেমন ছিল না, সমাজ-মনকে জানার তাগিদটাই ছিল মুখ্য। এর জন্য দেহের যতটুকু না জানলেই নয় কেবল সেইটুকুই এই পুস্তকে আমি অঙ্গীভূত করেছি। এও বলে রাখি দেহ মনের বিচার আমি করি নি। যা দেখেছি এবং বিজ্ঞানসম্মত বলে জেনেছি সেইটুকুই গুণী জ্ঞানী ও আগ্রহী পাঠকদের কাছে পবিবেশন করেছি। যে-সব বিষয়ে আমি নিজে কৃতনিশ্চয় এখনো হইনি সেগুলি আমার কাছেই রেখে দিলাম।

সাঁওতালদের সম্বন্ধে আমাব প্রথম পুস্তক 'আলেখ্য'। পল্লীবাসী গরীব সাঁওতালদের উন্নতিকল্পে একটা নতুন কম-পদ্ধতিব কথা জানানোই ছিল সেখানে আমাব মূল উদ্দেশ্য।

এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছি অনেক আগেই অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রয়াত অমিয়কুমার সেনের তাগিদে। তিনি স্বেচ্ছায় এটি প্রকাশের ভার নিয়েছিলেন এখন থেকে সাত বছর আগে। পুস্তকের নামটি তাঁরই দেওয়া। হঠাৎই তাঁর অকাল প্রয়াণে পাণ্ডুলিপি অন্ধকারেই থেকে যায়। তাঁর সহজসাধ্য কাজটি আমার কাছে দুরূহ হয়ে পড়ে। কিছুদিন আগে এই সমীক্ষার বিষয়বস্তুর প্রতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় আকৃষ্ট হন এবং তিনিই জনৈক প্রকাশককে এই গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহিত করেন। ছাপাব কাজ দ্রুত এগোলেও শেষ পযন্ত প্রকাশ বিঘ্নিত হয়। অবশেষে আমার প্রীতি-ভাজন শ্রীপ্রতাপচন্দ্র কানুনগো নতুন করে সেতুবন্ধ বচনা করেন 'সমতট প্রকাশনী'র সঙ্গে। উভয়ের অনুকূল্যে শেষ পর্যন্ত এই বই প্রকাশ লাভ করল।

সাঁওতালদের মধ্যে আমার কাজ দেখে যিনি সর্বপ্রথম উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন সেই স্বনামধন্য অধ্যাপক স্বর্গত নির্মলকুমার বসুকে এখানে শ্রদ্ধাব সঙ্গে স্মবণ করি।

আমাকে উৎসাহিত করে, নির্দেশাদি দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছেন আমার গুরুপ্রতিম শিক্ষক ড. তরুণচন্দ্র সিংহ, মনঃসমীক্ষক। তাঁরই উৎসাহে এবং প্রচেষ্টায় ছয়টি প্রবন্ধ ভারতীয় মনঃসমীক্ষণ সমিতির মুখপত্র 'চিত্ত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৩৮১ থেকে ১৩৮৩ সালের মধ্যে। ঐ প্রবন্ধগুলিকে সংগঠিত করে হয় এই 'সাঁওতালসমাজ-সমীক্ষা'। আজ শিক্ষিত সমাজের কাছে উপেক্ষিত অশিক্ষিত সমস্যাজর্জরিত এক সমাজকে উপস্থাপিত করার সাহস করেছি তাঁরই পথনির্দেশে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত করার প্রচেষ্টায় সাগ্রহে সম্মতি দান করার জন্য 'চিত্ত' পত্রিকার সম্পাদককে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আর একজন, যাঁর প্রীতি ভালোবাসা পেয়ে আমি ধন্য, যাঁর কর্মজীবন আমার কার্যধারায় উজ্জ্বল দীপশিখার মতো — সেই কর্মবীর শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্তের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ শ্রীসুরজিৎ সিংহ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন এই পুস্তকের মুখবন্ধ রচনা করে। তাঁর কাছে এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই সঙ্গে কয়েক শত সাঁওতাল গ্রামবাসী স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বালিকা ও তাদের পরম হিতৈষী ও আমার সুহৃদ 'আমার কুটির'এর প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বর্গত মনোরঞ্জন দত্তর অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের স্মরণ করছি।

এই গ্রন্থে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু-অঙ্কিত সাঁওতাল জীবনের কয়েকটি রেখাচিত্র মুদ্রিত হওয়ায় গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি হল ব'লে বিশ্বাস করি। শিল্পী শ্রীবিশ্বরূপ বসু এই ছবিগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। গ্রন্থের প্রচ্ছদলিপি এঁকে দিয়েছেন শান্তিনিকেতন কলাভবনের প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীসনৎ কর। শান্তিনিকেতন পাঠভবনের শিক্ষক শ্রীঅনাথনাথ দাস প্রথমাবধি এই গ্রন্থ প্রকাশে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। মুদ্রণ এবং প্রকাশের নানা জটিলতার দিনে তাঁর নিরন্তর উৎসাহ ও অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। এঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

শ্রীধনপতি বাগ

মুখবন্ধ

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে ভুবনডাঙা ও সুরুল গ্রামের যে ডাঙা-জমিতে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর যে ব্যাপক কর্মকাণ্ড গড়ে উঠেছে সেই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী ছিলেন সাঁওতালরা। এখনও পিয়াসর্ন-পল্লী, বালিপাড়া, বাগানপাড়া প্রভৃতি সাঁওতাল পল্লীতে তার অবশেষ রয়ে গেছে।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুরু থেকেই সাঁওতালদের জীবন-যাত্রা ও সংস্কৃতির প্রতি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। নানা সময়ে শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর শিক্ষক, শিল্পী ও কর্মীরা সাঁওতালদের জীবন-যাত্রার বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিছু লিখেছেন; কেউ কেউ তাঁদের শিল্পকর্মে ওঁদের বলিষ্ঠ জীবনের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাও আমাদের সব সময়েই মনে হয়েছে এই সমগ্র প্রচেষ্টা এখনও অকিঞ্চিৎকর। চরম দারিদ্রের মধ্যে সাঁওতালরা আজও কোন্ অন্তর্নিহিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির জোরে তাঁদের সমূহ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সজীব রেখেছেন তা আমাদের জানা নেই। আবার বাইরের থেকে মনে হয়, চারিদিকের হিন্দু ও আধুনিক সভ্যতার চাপ যেন তাঁদের সাংস্কৃতিক প্রাণের কেন্দ্রে অতিরিক্ত চাপ দিচ্ছে। হয়তো এই চাপে এই প্রাচীন জাতির সাংস্কৃতিক কাঠামোর অসাধারণ সুষমা চিরতরে বিধ্বস্ত হবে।

সাঁওতালরা আজও নিজেদের 'হড়' বা মানুষ বলেন, আর প্রতিবেশী হিন্দুদের বলেন 'দিকু' (বিদেশী, ঠিক পুরোপুরি মানুষ নয়)। আমরা বহু শত বছর কাছাকাছি বাস করেও পরস্পর থেকে আজও অনেক দূরে রয়েছি। আপাততঃ হয়তো এই দূরত্ব কিছুটা নিরাপদ। কিন্তু আশা করব উভয় পক্ষ থেকেই কোনো কোনো সংবেদনশীল ও চিন্তাশীল ব্যক্তি এই

অস্বাস্থ্যকর ব্যবধানের গণ্ডী অতিক্রম করে অপর পক্ষকে গভীরভাবে ও সঠিকভাবে চেনার চেষ্টা করবেন।

মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক ধনপতি বাগ মহাশয় সমাজসেবার কাজ করতে গিয়ে সাঁওতালদের সমাজ, সংস্কৃতি ও মনের কথা বুঝতে চেষ্টা করেছেন। যাঁরা তাঁর সাঁওতাল জীবনযাত্রার ভিত্তিতে লেখা 'আলেখ্য' পড়েছেন তাঁরাই জানেন ধনপতিবাবু বীরভূমের সাঁওতালদের জীবনের কত কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছেন। 'সাঁওতালি সমাজ-সমীক্ষায়' লেখক নৃতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণী পদ্ধতির নিপুণ প্রয়োগ করলেও বক্তব্য পাণ্ডিত্যের চাপে নীরস করে তোলেন নি। সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতির গঠনের সামগ্রিক বিবরণ দেওয়া ছাড়াও আধুনিক কালে তাঁর পরিচিত কয়েকটি ব্যক্তি ও পরিবারের অন্তরঙ্গ চিত্র পরিবেশন করেছেন। তাঁর বিবরণ থেকে মনে হয় বাইরের সমাজের অর্থ ও কামনার আকর্ষণ সাঁওতাল সমাজের মেয়েদের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিমণ্ডলের বাইরে দুর্বার গতিতে উৎক্ষিপ্ত করছে, ফলে সমাজের গঠন শিথিল হয়ে পড়ছে। সাঁওতাল পুরুষরা অসহায়ভাবে এই কালপ্রবাহকে দেখে যাচ্ছেন।

আমরা এবার আশা করব ধনপতিবাবুর তৃতীয় লেখায় সাঁওতাল সমাজ তাঁদের নিজেদের সমস্যা নিয়ে কি ভাবে চিন্তা করছেন ও সমস্যা সমাধানের পথে কোন্ কোন্ বিকল্প ধাপে এগোচ্ছেন সে বিষয়ে আলোকপাত করবেন। সাঁওতালরা কি ভাবছেন আবার দিকুদের বিরুদ্ধে 'হুল' (বিদ্রোহ) না করে তাঁদের উপায় নেই, না তাঁরা মূলত হাল ছেড়ে দিয়েছেন? তাঁদের সামনে দিকুদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করে এগোনোর পথ কি সত্যই খোলা রয়েছে?

শ্রীসুরজিৎ সিংহ

ভূমিকা

বন্ধুবর শ্রীধনপতি বাগ মহাশয় সাঁওতালদের নিয়ে ইতিপূর্বে 'আলেখ্য' নামে যে বই লেখেন তার ভূমিকাটিও আমাকে লিখতে হয়েছিল। আজ দশ বছর পরে তিনি আরো একখানা বই বের করছেন সাঁওতালদের নিয়েই ; আবার তিনি এর পরিচিতি লিখতে বলেছেন। বন্ধুর অনুরোধ অগ্রাহ্য করা যেমন শক্ত, এক্ষেত্রে পালন করাও তেমনি শক্ত। কেন না 'আলেখ্য'র মুখবন্ধে আমি যা লিখেছিলাম, তার অতিরিক্ত বেশি কিছু লেখার পুঁজি আমার অভিজ্ঞতায় দেখতে পাচ্ছি না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সাঁওতালদের ভিতরকার জীবন দেখবার অবকাশ আমার ঘটেনি, আমি তাদের বাইরে থেকেই দেখেছি। ভিতর থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন ও দেখছেন ধনপতিবাবু, তাঁর মনোবিশ্লেষক দৃষ্টিভঙ্গী ও শিক্ষা-দীক্ষা থেকে। আসলে ধনপতিবাবু একজন সাইকো-অ্যানালিস্ট, এই হিসেবেই তিনি বিশ্বভারতীতে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমার দেখা তো বাইরের দেখা। বাইরে থেকে দেখারও একটা স্থান আছে। কিন্তু ভিতর থেকে দেখাটাই আসল দেখা। সাঁওতালদের ভিতর থেকে দেখাটি যে কত কঠিন ও কত ধৈর্যসাপেক্ষ সেটা বোঝা উচিত, কেন না সাঁওতালরা মুখর জাতি নয়, বরং নীরবই বলা চলে ; বিশেষ করে বাইরের লোকেদের কাছে—'দিকু'দের কাছে তো বটেই। বাঙালী বিহারী এদেরকে ওরা 'দিকু'ই বলে। 'দিকু' শব্দের একটি অর্থ নাকি সাঁওতালিতে 'ডাকাত', কমপক্ষে বিদেশী ; যারা তাদের এতকাল ক্ষতি করেই এসেছে। তাদের এই মানসিক প্রতিরোধের বাধাকে অতিক্রম করে ধনপতিবাবু যে তাদের অন্দরমহলে ঢুকে যেতে পেরেছেন, এতে তাঁর অসীম ধৈর্য, হৃদয়বত্তা ও আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। ধনপতিবাবু সাঁওতালদের ভালোবাসতে পেরেছেন এবং একমাত্র এই

ভালোবাসাই মানুষকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে। আমার উপরোক্ত ভূমিকায় আমি লিখেছিলাম "সাঁওতাল পল্লীগুলি আব্রু নিয়ে ঢাকা থাকে না, তাদের খোলা পাড়াগুলি নিজেদের ভাষা ও অন্তর্মুখী সভ্যতার পর্দা দিয়ে ঢাকা।" এই 'ঢাকা' অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকতে পেরেছেন যে মুষ্টিমেয় দিকু', ধনপতি বাগ তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট।

এবারে ধনপতিবাবু সাঁওতালি সভ্যতার ধর্মানুষ্ঠান, আচার-বিচার, স্ত্রী-আচার উৎসব, বিবাহ, নানা ধরনের বিবাহ ও যৌনজীবন, বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি সামাজিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। সাইকোলজির সীমা অতিক্রম করে সোসিয়োলজিতে পৌঁছে গেছেন বলা চলে। আমি আশা করব তিনি আরো অগ্রসর হবেন, সাঁওতালদের অর্থনীতি, রাজনীতি, স্বায়ত্ত-শাসন, সাঁওতালি সমাজে মেয়েদের স্থান ইত্যাদি ব্যাপারে আরো গবেষণা ও রচনা প্রকাশ করবেন, যদিও এইসব লেখার মধ্যে এখনই সে সব বিষয় স্থানে স্থানে উঁকিঝুঁকি দিয়ে উপস্থিত। সাঁওতালি সমাজের সাঁওতালি ব্যক্তিজীবনের টোটালিটি বা সামগ্রিক বিচার ছাড়া একদেশদর্শী কোনো অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিনের সীমাবদ্ধতা লেখক নিজেই অনুভব করেন। অবশ্য তিনি আশা করেন, অন্যান্য ডিসিপ্লিনের গবেষকরা অগ্রসর হবেন, তিনি সেখানে ছাড় দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আমার ধারণা এই ক্ষেত্রে অন্য এমন অনেকে নেই যারা এসব বিচার-বিশ্লেষণ করতে খুবই আগ্রহী। তাঁকে নিজেকেই আরো অগ্রসর হতে অনুরোধ করি।

'আলেখ্য'র ভূমিকায় আমি আক্ষেপ করেছিলাম যে, ধনপতিবাবু তাঁর লেখাতে এমন কোনো ইঙ্গিত দিতে পারেন নি, যাতে সাঁওতালদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বা আশাবাদ সম্বন্ধে কিছু তথ্য বা সংবাদ আছে। এই পুস্তকেও কোনো আশার কথা নেই, বরং নৈরাশ্যটা পাঠকের মনকেও অভিভূত করবে। শিক্ষিত সাঁওতালরা ধনপতিবাবুর বই পড়েন বা

পড়বেন কিনা জানি-না। শিক্ষিত সাঁওতালদের হাল-চাল-চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাচ্ছে, নিজেদের সমাজের হয়তো আর কিছুই ভালো দেখতে পান না। তারা দিকু-সভ্যতার আলেখ্যতে নিজেদের মুখও পরিমাপ করতে শুরু করেছেন। এদিকে সাঁওতালি সমাজ ভাঙছে তো ভাঙছেই—নির্মম নিষ্ঠুর তার ঘাত-প্রতিঘাত। হীনমন্যতা তার মধ্যে ঢুকছে তো ঢুকছেই— শিক্ষিত সাঁওতাল তার নিজের সমাজ সম্বন্ধে হয়তো আজ লজ্জিত। সমাজ প্রধান সাঁওতালি-সমাজ আজ ব্যক্তিবাদী হতে চলেছে, অর্থাৎ যার-যার ভার তার-তার হাতে চলেছে। আমি লিখেছিলাম, "একদিন সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি সভ্যতা তাদের কেবল বাইরে থেকেই আঘাত দিয়েছে। জমিদারি প্রথা গেছে, কিন্তু সাঁওতাল তার নিজের জমিতে অধিকার পায় নি, সেখান থেকেও তাকে তাড়া করছে, কিন্তু ভিতর থেকে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে কলের সভ্যতা, টাকার সভ্যতা।" এ যে কি ভয়াবহ কাণ্ড ঘটাচ্ছে সাঁওতালদের নৈতিক জীবনে তার চিত্র বেরিয়েছে এই বইতে। বিশ বৎসর পূর্বে একটি মাত্র বঞ্চিতা সাঁওতাল রমণী গোলাপ শেষ পর্যন্ত সমাজ-বিদ্রোহী হয়ে বেশ্যাবৃত্তির আশ্রয় নিয়েছিল, আর আজ শান্তিনিকেতনের প্রান্তেই দলে দলে সাঁওতাল রমণীদের দেহদানের ব্যবসায়ে অগ্রসর হতে দেখেছেন ধনপতিবাবু। আর এই দেহদান করছে কাদের কাছে? দিকুদের কাছে। এই লজ্জা কি একমাত্র সাঁওতাল সমাজের? হিন্দুদের নয়? মুসলমানদের নয়—সকল দিকুদের নয়? এর সংশোধন কি আজ সাঁওতালদের পক্ষে একা সম্ভব?

ধনপতিবাবু লিখছেন, "আমি মনে করি, শুধু সাঁওতাল বা শুধু দিকু অর্থাৎ 'ওরা' ও 'আমরা' আলাদা দুটো সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সমাজ বা দল, এই চিন্তা আপাততঃ ত্যাগ করতে হবে, উভয় দলকেই। আজকে সাঁওতাল সমাজে যে ভাঙন সাঁওতালি মেয়েরা এনেছে এবং আনছে, যে ভাঙনকে তাদের সমাজ-কর্তারা সামলাতে পারছে না, তার প্রতিরোধ-

ব্যবস্থা অতি সত্বর করা দরকার ; এবং সেটা করা সম্ভব যদি উভয় দল মিলে একটি মিশ্রিত সমাজদল সৃষ্টি করে সম্মিলিতভাবে সমাজ-শাসন-পদ্ধতির প্রবর্তন করা যায়।" কিন্তু এ বড়ো কঠিন কাজ, যেখানে বৃহৎ হিন্দু-সমাজই খান খান হয়ে ভেঙে যেতে চাইছে।

সাঁওতাল ও হিন্দু সমাজ পরস্পর পাশাপাশি থেকে কেউ কারো দ্বারা প্রভাবিত কোনো কালেই হয় নি, একথাই কি ঠিক ? ধনপতি-বাবুর এই বইতে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ পূজা উৎসব ইত্যাদির যে সবিশেষ বর্ণনা আছে, তার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার মেইন স্ট্রিম, বিশেষ করে হিন্দুদের আচার-বিচার স্ত্রী-আচারের মাঝে মাঝেই মিল দেখা যায়। সিঁদুর, তেল-সিঁদুর, তেল-হলুদ, টোপর, আতপ চাল, বলিদান, দূর্বা, পা ধুইয়ে দেওয়া ইত্যাদির যে-সব স্ত্রী-আচার দেখি, সেটা হিন্দুদের কাছ থেকে সাঁওতালরা নিয়েছিল, না সাঁওতালদের কাছ থেকে হিন্দুরা নিয়েছে— এ বিষয়ে গবেষণার অবকাশ আছে, হয়তো কিছু কিছু হয়েছেও।

তাছাড়া ধনপতিবাবু সাঁওতালদের মধ্যে পঞ্চায়েতী বিচার ও পঞ্চায়েতের উল্লেখ করেছেন—এই পঞ্চায়েতের আবির্ভাব ও প্রভাব কোথা থেকে কোথায় এসেছিল ? বিকেন্দ্রীকৃত আত্মশাসন বা স্বশাসনের প্রয়োজনীয়তা যখন নতুন করে অনুভূত হচ্ছে তখন স্বশাসিত স্বয়ং-সম্পূর্ণ সাঁওতালি সমাজ-ব্যবস্থাপনায় শক্তি ও দুর্বলতা কি ছিল বা তার কি রূপ আজ বর্তমান, সে সম্বন্ধেও বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ আছে।

কিন্তু সাঁওতাল ও হিন্দু সমাজের মিলিত সমাজ-শাসনের ফল সম্বন্ধে ধনপতিবাবু যখন ইঙ্গিত করেছেন, তখন বুঝতে হবে যে এই দুই পক্ষের শক্তি সমান সমান নয়, অসমানের এই মিলিত ভূমি বা unequal partners দের মিলিত ভূমিকা অত্যন্ত দুর্বল ও ভঙ্গুর। তার

সার্থকতা নির্ভর করে উভয় সমাজের শিক্ষিতদের নতুন ধরনের ধ্যান-ধারণার উপর, যে ধ্যান-ধারণা আজ খুবই বিরল। ব্যক্তি-সর্বস্ব, আত্ম-সর্বস্ব ভোগবাদী সভ্যতাব চাকচিক্য ও affluent জীবনবাদ যেখানে ভারতীয় জীবদধারা বা main stream য়েই অবাধ প্রতিযোগিতা ও লণ্ডভণ্ড কাণ্ড কবে চলেছে, যেখানে সুস্থির চিত্তে নতুন ভারতের দিগ্-দর্শন কবাটাই শক্ত। ইয়োরোপ-আমেরিকার ভোগবাদী ব্যক্তিবাদী জীবন শিক্ষিত ভাবতবাসীদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। কাজেই এক্ষেত্রে আজ যদি সাঁওতালদেব বলি যে তোমরা আমাদের অনুকরণ কোরো না, তবে সেটা ভুল বোঝাবার কারণ হতে পারে। শিক্ষিত সাঁওতালরা ভাবতে পারেন, আমরা বুঝি হিতোপদেশ দেবার ছলে সাঁওতালদের মিউজিয়াম-পিস' করে যেখানে তারা যুগ যুগ ধরে ছিল সেখানেই থাকতে উপদেশ দিচ্ছি। যেখানে ছিল সেখানেই থাক, বা ফিরে যাক, এ আর হয় না, এমন কি যেখানে আছে সেখানেই থাক— এই কথাও চলে না চলবে না। সামনে এগোতেই হবে। কিন্তু সত্যিকার আসন বা সম্মুখটা কি, আশু সামনে কোনো অতলগর্ভ অপেক্ষমান কিনা, যদি তাই হয় তবে সাবধানে পথেব মোড ফেরাতে হবে সবাইকেই, হিন্দু মুসলমান খৃস্টান সাঁওতাল কোল ভীল সবাইকেই— জাতীয় জীবনেব সম্মিলিত ধারা বা main streamকেই সত্যিকার পথে, আলোকেব পথে প্রবাহিত করতে হবে। এ এক gigantic challange।

ইতিমধ্যে সাঁওতালদের সরল সুন্দর জীবন-সভ্যতা ভেঙে যাচ্ছে দেখে আমাদেরই যেন একটি বেদনা-বোধ হয়। আমাদের ভিতরের একটি যেন সরল পবিত্র কিছু ভেঙে যাচ্ছে মনে হয়। বাইরে থেকেও আমি যখন সাঁওতালদের সহজ সবল সুন্দব আনন্দময় জীবনটা দেখি; তখন একটা nostalgia যেন ভিতর থেকে হাতছানি দেয়। মনে হয় একদিন কোনো এক সুদূর অতীতে আমিও ঐরকম এক সহজ ও সাবলীল জীবনের অংশীদার ছিলাম— সে এক ঐতিহাসিক সুপ্ত চেতনার মতো।

আজ আমরা সভ্যতার স্তরে স্তরে বহু দূর এগিয়েছি, এক জটিল, ব্যক্তি-সর্বস্ব একাকীত্বের শ্মশানে এসে পৌঁছে মনে হচ্ছে কি যেন কবে ফেলে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সহজ সবল কোলটিকে ও উদার আকাশকেও কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। আজ কি রবীন্দ্রনাথের গানখানি মনে পড়ে না? "ওগো সাঁওতালি ছেলে, শ্যামল সঘন নববরষার কিশোর-দূত কি এলে··· বাঁশিব সুরেতে সুদূর দূবেতে চলেছ হৃদয় মেলে—" মনটি যেন ভারাক্রান্ত হয়ে আসে—কিসেব বেদনায়, কোন্ প্রকৃতির বিচ্ছেদে।

সাঁওতালসমাজ-সমীক্ষা
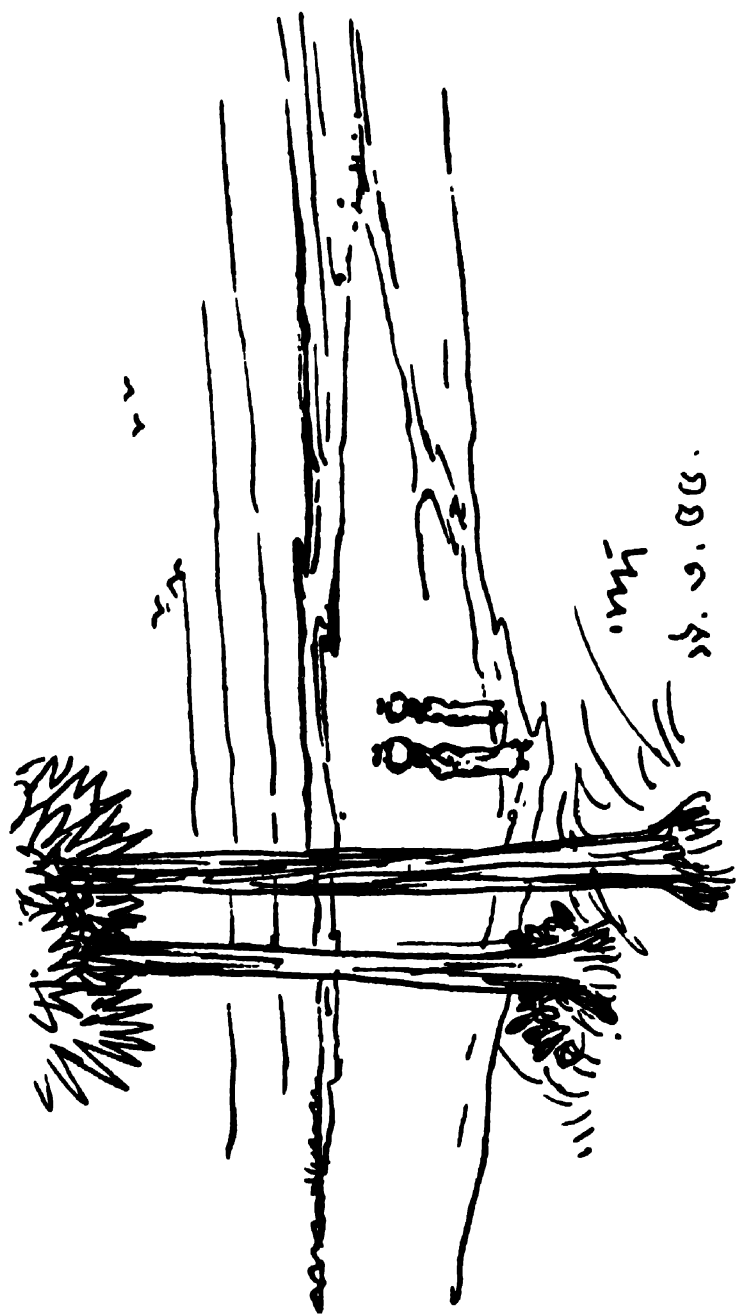
সাঁওতালি সমাজব্যবস্থায় ধর্মানুষ্ঠান

প্রথম অধ্যায়

বিষয়টি অতি বৃহৎ। অবশ্য সাঁওতালদের ধর্ম বলতে কি বোঝায় সেটা যদি ছেঁটে ফেলা যায় তাহলে বিষয়টা অনেকটাই ছোটো হয়ে যায়। এখানে আমিও সেই চেষ্টাই করব। তবে সাধারণভাবে যাতে কিছুটা ধারণা হয়, যেটুকু না বললেই নয়, সেটুকু বলতেই হবে। এখানে একটা কথা বলে রাখি, অন্য জাতির, বিশেষ করে হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে কোনো তুলনামূলক প্রশ্নের বিচার আমি করবার চেষ্টাই করব না। একথা বললাম এইজন্য যে, এদের অনুষ্ঠানের পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা, বিচার-বিবেচনা করতে গিয়ে বারবার এই প্রশ্নই আমার মনে উঠেছে, উঠতে বাধ্য বলেই। কিন্তু দুটোর অঙ্গাঙ্গী বিচার করতে গেলে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর দরকার, তার ক্ষেত্রই আলাদা। তাই ঐ বিষয়টি আমার বর্তমান আলোচ্য বিষয় থেকে সসম্মানে সরিয়ে রাখতে চাই।

সাঁওতালি সমাজ-ব্যবস্থার একটা কাঠামো আছে। এই কাঠামোর মধ্যে নানা বিধি-নিষেধের বেড়া দিয়ে দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ এরা করে। সংক্ষেপে সেটা হল : এই উদ্দেশ্যে সারা গ্রাম থেকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে নির্বাচন করা হয়। এই নির্বাচিত দলের সভ্যদের ভিন্ন ভিন্ন কাজ। তারা সকলে আলাদাভাবে বা যুক্তভাবে যখন যেমন দরকার নিজ নিজ কর্তব্য অবশ্যই পালন করবে। কেউ না করতে পারলে প্রধানকে (মাঝি) সে কথা জানাতে হবে এবং তার পরামর্শমতো পুনরায় কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য চেষ্টিত হবে। এইভাবে বছরের শেষে (আমাদের মাঘ মাস) একটি অনুষ্ঠানের দিন (মাঘ-সোহরাই বা মাঘ-সিম) ঐ সব ব্যক্তির কাজের বিচার হবে। ঐ সভাতেই আবার পরবর্তী বছরের জন্য নতুন করে নির্বাচন হবে।

নির্বাচিত ব্যক্তিরা হ'ল—

১ মাঝি বা সর্দার। ইনি হলেন গ্রামের শ্রেষ্ঠ মাতব্বর বা প্রধান।

২ পারানিক। ইনি মাঝির প্রথম সহকারী, মাঝির অবর্তমানে তাঁর প্রতিনিধিত্বের অধিকারী।

৩ জগমাঝি। ইনি মাঝির অন্যতম সহকারী। যে কোনো সামাজিক ব্যাপারে—ঘটনা থেকে দুর্ঘটনায়, এঁকে থাকতে হয় সদাজাগ্রত প্রহরীর মতো। এই সবের মধ্যে গ্রামের যুবক-যুবতীদের ও উঠতি-বয়সের ছেলেমেয়েদের আচরণের মান সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা এবং প্রয়োজনবোধে তাদের সাবধান করে দেওয়া এঁর একটি প্রধান কাজ। কোনো উৎসবাদিতে যেখানে কিছুটা বেলেল্লাপনার ছাড় থাকে সেই সব ক্ষেত্রে যাতে যৌন-ব্যাপারে মাত্রা ছাড়িয়ে না যায় সেটা দেখাও এঁর দায়িত্ব। এই সূত্রে ছেলেমেয়েরা এঁর কাছে তাদের মনের অনেক কথা জানিয়ে রাখে এবং তারা নিজ নিজ ব্যাপারে কে কতটা এগোবে বা পিছোবে তাও এঁর পরামর্শ-অনুযায়ী করতে হয়।

৪ জগ-পারানিক। জগমাঝি তাঁর কাজের সুবিধার জন্য একজন সহকারী নিতে পারেন, ইনি সেই ব্যক্তি। জগমাঝির অবর্তমানে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব এই জগপারানিকের উপরই বর্তায়।

৫ গোড়েৎ। ইনি মাঝির হুকুমদার হিসাবে কাজ করেন। এঁকে কোথাও কোথাও মারাং-মাঝিও বলা হয়ে থাকে। কোনো সভা-সমিতি আহ্বান করতে হলে ইনিই মাঝির হয়ে গ্রামের লোককে খবরাখবর দেন। কোনো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে হলে সে ব্যবস্থাও ইনিই করবেন মাঝির মুখপাত্র হিসাবে।

৬ নায়েকে। এক কথায় ইনি গ্রামের পুরোহিত। ধর্মানুষ্ঠানে পূজার ভার এঁর উপর। তাছাড়া পূজা উপলক্ষে বলি দেওয়ার কাজটাও প্রধানত ইনিই করে থাকেন।

৭ কুড়ুম-নায়েকে। এঁকে বলা যায় পাঁদাড়ের পুরোহিত। যে-কোনো ধর্মানুষ্ঠানে এঁর উপস্থিতি একান্তই দরকার। এঁর উপর ভার থাকে যত সব অপদেবতা আছে তাদের সন্তুষ্টি বিধান করা; কিম্বা কোনো কারণে তারা রুষ্ট হয়ে থাকলে যাতে কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন না করতে পারে তা দেখা, তাদের খুশি করা।

উপরোক্ত সকল ব্যক্তিই পদাধিকার বলে গ্রামীন পঞ্চায়েতের সভ্য। গ্রামের সমস্যাদি নিয়ে যখন বিচার-বিবেচনা করতে হয় তখন পঞ্চায়েত ডাকা হয়; সেইখানেই অধিকাংশ গ্রামীন-সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে।

যদি এই গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো সমস্যার সমাধান করতে অপারগ হয়, যেমন যখন গ্রামের পঞ্চায়েতের এলাকার বাইরের কোনো গ্রাম ঐ সমস্যার সঙ্গে জড়িত থাকে তখন প্রয়োজন বোধে সেই সেই গ্রামের মাঝি বা পঞ্চায়েতের সঙ্গে আবার আলোচনায় বসে। কোনো কারণে এই যুক্ত-সভাতেও যদি মিটমাট না হয় তখন পাঁচখানি গ্রামের মাতব্বররা, দরকার হলে পাঁচখানি গ্রামের সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষরা একত্র হয়ে সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করে। তাতেও যদি আশানুরূপ ফল না পাওয়া যায় তখন পরগণা-বৈঠক ডাকা হয়। এর পরে আছে সেন্দ্রা-বৈঠক। একে হাইকোর্ট বলা যেতে পারে। ভাববেন না, এদের সুপ্রীম কোর্ট নেই, তাও আছে। তবে সে প্রসঙ্গ এখন থাক।

বরং এই প্রসঙ্গে আর একটা প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বলে নিই। এই যে একটার পর একটা সভা ডাকা হয়, যদি সভাগুলি বিচার-সংক্রান্ত হয় তাহলে তার খরচ আছে। খরচ উভয় পক্ষকেই বহন করতে হয়। তবে গ্রাম পঞ্চায়েৎ যদি কাউকে দায়ী করে সভা আহ্বান করে এবং তাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মতি থাকে তাহলে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই এই ব্যয়ভার বহন করতে হবে। অতএব বড়োর বড়ো সভা ডাকতে হলে সেই অনুপাতে খরচও বৃদ্ধি পাবে। খরচটা হয় হাঁড়িয়া বা মদ (পচুই)-এর জন্য। লোকের সংখ্যা আন্দাজ করে গোড়েৎ-এর সঙ্গে পরামর্শ করে কয় কলসি হাঁড়িয়া লাগবে সেটা ঠিক করে নেওয়া হয়। এইজন্য সাধারণত কোনো মাতাল-শালের কাছাকাছি জায়গায় এরা সভা করতে বসে। যাতে বৈঠক শেষ করে সকলে মিলে (যদি মিটমাট হয়ে যায় তবে এক দলে, নয়তো ভিন্ন ভিন্ন ভাবে) ঐ পানশালায় গিয়ে তারা হাঁড়িয়া পান করতে পারে।

আরো একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন। এই যে পঞ্চায়েতের কথা উল্লেখ করলাম এর সঙ্গে ভারত-সরকার-প্রবর্তিত পঞ্চায়েতী-রাজের কোনো সম্পর্ক নেই। সাঁওতালদের পঞ্চায়েত-প্রথা বহু পুরোনো সংগঠন।

এখন সাঁওতালদের ধর্ম সম্বন্ধে অল্প কিছু বলা প্রয়োজন।

সাঁওতাল-ধর্মের মূল কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। এদের আদি দেবতার খোঁজ করতে গিয়ে কেউ বলেছেন,

তিনি হচ্ছেন 'সিং-বোঙ্গা'।[১] আবার কেউ বলেছেন 'চাণ্ডো' বা 'চাণ্ডো-বোঙ্গা' হচ্ছেন এদের মূল দেবতা।[২] আবার একজন বলেছেন 'ঠাকুর'ই হচ্ছেন এদের আদি দেবতা।[৩] আর এক সাহেব লিখেছেন, 'cando-the creator'[৪] এঁরা বিদেশী, এবং ধর্মপ্রচারক। যে-যে অঞ্চলে এঁরা ধর্মপ্রচার উপলক্ষে গিয়েছেন সেই সেই অঞ্চলের দ্বারা এঁদের ধারণা প্রভাবিত। দুম্‌কা অঞ্চল থেকে জনৈক ভারতীয়[৫] জানিয়েছেন ঐ অঞ্চলে তিনি সাঁওতালদের আদি দেবতার নাম শুনেছেন 'Kando.' এই নামের সঙ্গে 'Cando'র তফাৎ আসলে বোধহয় কিছু নেই।

স্থানীয় সাঁওতালদের জিজ্ঞাসা করে দেখেছি। এ ব্যাপারে তারা মুখ খুলতে চায় না। মুখে ঐ দেবতার নাম নাকি নিতে নেই। তবে উঠতি বয়সের ছেলেদের কাছে 'লিটা'র নাম শুনেছি, তিনি নাকি এই মাটির পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। যাই হোক, সাঁওতালরা যে একজনকে শ্রেষ্ঠ বা সৃষ্টিকর্তা, যিনি জাগতিক সব কিছুর উপর প্রভাব বিস্তার করেন, এক কথায় সর্বশক্তিমান, এ বিশ্বাস রাখে; এই দিক থেকে একেশ্বরবাদী বলা চলে।

কিন্তু এদের ধর্মানুষ্ঠান, পূজা-পার্বন দেখলে মনে হবে না যে এরা একেশ্বরবাদী হতে পারে। কেননা এরা একসঙ্গে অনেকগুলি বোঙ্গার পূজা করে, তাদের উদ্দেশে বলি দেয়, মন্ত্রপাঠ করে, নানা নিয়ম পালন করে।

এই বোঙ্গাকে যদি দেবতা বলে ধরা হয় তাহলে কি করে এদের একেশ্বরবাদী বলা যায়? আমার মনে কিন্তু ভিন্ন চিন্তা এ সম্বন্ধে হয়েছে। পরে তার কিছু আভাস দেবার চেষ্টা করব।

চেষ্টা করেছি জানবার জন্য কাদের এরা বোঙ্গা বলে। এ প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর এরা দেয় না; বা দিতে পারে না বলেই আমার মনে হয়েছে। যেটুকু কথাবার্তায় আলাপ-আলোচনায় বোঝা যায়, তা হচ্ছে, বোঙ্গা মানে একটা অশরীরী শক্তি; যাকে উপলব্ধি করা যায় কিন্তু চোখে দেখা যায় না। এইরূপ বহু রকমের শক্তি বা বোঙ্গার উপর বিশ্বাস এবং বিভিন্ন অনুভূতি নিয়ে সাঁওতালরা ঘর করে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা ভাবতে পারেন, এ হচ্ছে কু-সংস্কার। হতে পারে, কিন্তু

১ H. H Risley; ২. E G. Man; ৩. Skrefsurd ৪. Bompass;
৫. P. C. Biswas

এই অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত গ্রামবাসী সাঁওতালরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে বোঞআদের বিরক্ত করতে নেই, কোনো কারণে তাঁরা অসন্তুষ্ট হলে ব্যক্তির বা সমাজের অকল্যাণ হবে। তাই পূজানুষ্ঠান ছাড়া এদের কোনো উৎসব নেই। সবার আগে বোঞআদের পূজা করতে হবে। বোঞআ-পূজায় কিন্তু কোনো মূর্তি নেই। সবই নাম করে এক এক জনের উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়। একটি কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার, তা হচ্ছে, সর্বশক্তিমান যে দেবতা তারও কোনো কাল্পনিক মূর্তির ধারণাও এদের নেই। তাঁর বৈশিষ্ট্য, তিনি কারো ক্ষতি করেন না। তিনি সব সময়ই সাঁওতালদের কল্যাণ কামনাই করেন। এইজন্যই বোধ হয় সাঁওতালদের এঁর পূজা করতে দেখা যায় না। যত পূজা-অর্চনার ঘটা সব বোঞআদের জন্য। কেন না এরা রুষ্ট হলে মানুষের ক্ষতি করতে পারে।

কতগুলো বোঞআকে এঁরা মান্য করে তা সঠিক ভাবে বলা শক্ত। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি অঞ্চলভেদে এই সংখ্যার বা নামের তারতম্য হতে পারে। আমি যে কয়টির নাম শুনেছি সেগুলি এখানে লিপিবদ্ধ করছি—

সিং বোঞআ, পরগণা বোঞআ, মাঝি বোঞআ, জমসিম বোঞআ, মারাং বুরু, জাহের এরা, মঁড়েকো তুরুক, গোঁসাই-এরা, আরেগে বোঞআ। যখন শুধু বোঙা বা বোঞআ বলবে তখন বুঝতে হবে ঘরের বোঞআ। এছাড়া আরো আছে; যেমন, কিঁসাড় বোঞআ, সিমা বোঞআ, সুরুৎ বোঞআ, জড়ি বোঞআ, হুরুৎ খুন্টুৎ বোঞআ ও জজম বোঞআ।[১]

এই যে সব বোঞআ, এরা সকলে এক শ্রেণীর নয়। প্রথমত এদের দুভাগে ভাগ করা যায়: ১ ক্ষতিকারক বা দুষ্ট বোঞআ, ২ ক্ষতি-কারক নয়; কেউ কেউ ভালোও করে, তবে তাদের ক্রোধ ঘটালে তারা ক্ষতিও করতে পারে।

এছাড়া আর একপ্রকারে এদের শ্রেণী-বিভাগ করা যায়। যেমন বোঞআদের নিজস্ব এলাকা আছে। তাদের ক্রিয়া-কলাপ সেই সেই এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যেমন পরগণা বোঞআ—পরগণা হল

১ এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য 'বাহা-পরব' দ্রষ্টব্য।

তার এলাকা। সেই এলাকাটাই তার ক্রিয়া-কলাপের রাজত্ব। আবার যেমন শুধু 'বোঞআ' বললে বুঝতে হবে এ হল অন্দর-মহলের, ঘরের ভিতরকার বোঞআ। বাইরে তার কোনো এক্তিয়ার নেই। এ যেমন বিস্তৃতি নিয়ে শ্রেণীবিভাগ, তেমনি আছে বিষয় নিয়ে। যেমন, কারো ধনী হবার ইচ্ছা হলে সে কিঁসাড় বোঞআকে পূজো করবে। কারণ ইনি খুশী হলে অর্থাগম হতে পারে।

এই সব বোঞআদের মধ্যে কেউ বা স্ত্রী, আবার কেউ বা পুরুষ। অতএব লিঙ্গ-ভেদেও এদের ভাগ করা যেতে পারে।

অতএব সাঁওতালদের ধর্মের অন্তর্নিহিত ভাবটি অর্থাৎ একেশ্বরবাদিতা যদি উপেক্ষিত হয় তাহলে এদের ধর্মকে বোঞআর রাজত্ব বা বোঞআ-ধর্ম বলা যেতে পারে। এ মনোভাব আমি কিছু কিছু শিক্ষিত লোকের মধ্যে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এরূপ মনে করা বোধহয় অন্যায়। কেন না, বোঞআকে ডিঙিয়ে এদের মন যে সুদূরের কোনো অতীন্দ্রিয় শক্তিতেও বিশ্বাস রাখে তা নানান পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে পূজানুষ্ঠানাদিতে, বিপদ-আপদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

আগেই বলেছি সাঁওতালি ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমার বিষয়-বস্তু নয়। অতএব এদের সমাজ-শাসন ব্যবস্থা এবং ধর্ম সম্বন্ধে যে সামান্য আলোচনা এখানে করলাম এরই পরিপ্রেক্ষিতে একটি পরবের কথা নিবেদন করে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। এই পরবের মধ্যেই দেখা যাবে বোঙা-আদির পূজা থেকে শুরু করে নৃত্যগীতাদি মিলে সারা গ্রাম কিভাবে উৎসবায়িত হয়। আশা করি পাঠক এর থেকে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারবেন যে এদের উৎসব বাইরে থেকে যা দেখা যায় আসলে শুধু তাইই নয়, অর্থাৎ কেবল নাচ গান আর মাৎলামি করা নয়। এর সামগ্রিক রূপটা একটু ভিন্ন জাতের।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উৎসব অনুষ্ঠান। বাদ্‌না পরব

বাদনা পরব সাঁওতালদের সবচেয়ে বড়ো পরব। ওরা কখনো বলবে না বাদ্‌না-পূজো। কিন্তু মনের পিছনে যে ঐ পূজোর ধারণাটা সবসময়েই আছে সেটা বোঝা যায়, যদি প্রশ্ন করা হয়, 'তোমাদের বাদ্‌না পরবটা কি রকম গো?' তখন বলবে, 'ঐযে, তোমাদের যেমন দুগ্‌গো পূজো, আমাদের তেমনি বাদ্‌না পরব'। তাই বোধহয় বাইরে থেকে এই পরবকে নাচ, গান, হাঁড়িয়া খাওয়া এবং নানা প্রকারের ফুর্তির ব্যাপার বলেই আমাদের ধারণা জন্মেছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান যারা বাদ্‌না পরব দেখেছেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করে ঐ নাচ, গান আর বেলেল্লাপনার বিবরণই পেয়েছি। সাঁওতালদের কাছাকাছি বহু বছর ধরে বাস করছে, এমন কি এই পরবে মদ বনাম হাঁড়িয়া বছর-বছর খেয়ে এসেছে এমন লোকের ঐ একই ধারণা। সহরে দুর্গাপূজোর প্যাণ্ডেলের ঝক্‌মকি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভিড় দেখে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যে ধারণা হয় সাঁওতালদের পরব সম্বন্ধে অ-সাঁওতালিদের তার থেকেও অসম্পূর্ণ ধারণা রয়েছে। তার একটা কারণ হিন্দুদের পূজোর প্যাণ্ডেলে চাক্ষুষ করার মতো একটি মূর্তি আছে। এদের কোনো পরবে তো তা নেই। কারণ এরা তো মূর্তিপূজো করে না, সে কথা আগেই বলেছি।[১] আমার ধারণা হয়েছে পরব কথাটার সঙ্গে পূজোর সম্পর্ক ওরা বোধহয় ইচ্ছে করেই প্রচ্ছন্ন রাখে। ওরা চায় না, পছন্দ করে না যে ওরা ছাড়া, তাও সাঁওতাল পুরুষরা ছাড়া পূজোটা অন্য কেউ দেখুক। যাই হোক এই পূজার ব্যাপারটা কি ধরনের সে-সম্বন্ধে এখানে কিছু নিবেদন করছি। কিন্তু তার আগে এই পরবের বা পূজার প্রস্তুতি-পর্ব সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। সেইটাই আগে বলি।

বাদ্‌না পরব হয় পৌষ মাসে। এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট তারিখ বা তিথি আগে থাকতে ঠিক করা থাকে না। এক এক গ্রাম সাধারণত

১ সাঁওতালরা আজকাল কোনো কোনো জায়গায় মূর্তি-পূজো শুরু করেছে, বিশেষ করে কালী-ঠাকুরের মূর্তি নিয়ে সারা রাত ধরে কোনো কোনো গ্রামে পূজো হতে দেখেছি।

এককভাবে শুরু করার তারিখ ঠিক করে। সেই অনুযায়ী শেষও হয়। অবশ্য সকলেই চেষ্টা করে যাতে পরবের শেষ দিনটা পয়লা মাঘ না পার হয়ে যায়। সব সময় যে সে-চেষ্টা সফল হয় তা নয়। কিন্তু শুরুটা অর্থাৎ পূজার ব্যাপারটা পৌষ পেরিয়ে মাঘে চলে এসেছে এমন অঘটন ঘটতে শুনিনি। কিন্তু এমন কখনো ঘটবে না একথা কেউ হলফ করে বলতে পারে না; কারণ পরবের দিন ঠিক করার একটা অবশ্যকরণীয় কাজ হল মাঠের ধান খামারে তোলার সব কাজ শেষ করা। এ সব ভাবনা ভাববে বিশেষ করে পুরুষরা।

পুরুষরা কবে পরবের দিন ধার্য করবে সেই আশায় মেয়েরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকে না। তাদের অনেক কাজ। পরবের প্রধান পূজাটাই হচ্ছে প্রথম দিনে। সেই পূজা দেখা বা শোনা মেয়েদের পক্ষে নিষিদ্ধ। তা হোক। গৃহস্থালীর কাজ তো কম নয়। সবার আগে তারা ঘর-দোর লেপা-পোঁছার জন্য ব্যস্ত হয়। কোন্ মাঠে কোন্ রঙের মাটি পাওয়া যায় সে খবর আগেই সংগ্রহ করে রেখেছে। কার জন্য কি রকমের পৈছি-পরহান লাগবে, সেটাও ভেবে রাখতে হয়। সম্ভব হলে আগে থাকতে কিছু কিছু সংগ্রহ করেও রাখা যায়; এইরকম নানান চিন্তা তাদের। এছাড়া আরো একটা বড়ো কাজের ভার তাদের মাথার উপরই চাপিয়ে দেয় পুরুষরা। সেটা হল হাঁড়িয়া তৈরি। এই বস্তুটি শুধু পূজার্চনার একটি মূল বস্তু নয়, সকলের আনন্দের এবং আকর্ষণের উৎসও বটে। কোন্ কোন্ কুটুম আসার সম্ভাবনা আছে সে কথা আগে থাকতেই আন্দাজ করে নিতে হবে। সেই অনুযায়ী চালের পরিমাণ ঠিক রাখতে হবে। সাধারণ ভাত-মুড়ির চাল দিয়ে তো আর পচুই করা যাবে না। পচুইয়ের জন্য আলাদা করে চাল করতে হবে। সেটা তৈরি রাখতে হবে, মরদদের মুখ চেয়ে বসে থাকলে হবে না। তবে অন্তত দশটা দিন হাতে রেখে পরবের দিন ঠিক করে বলতে হবে মেয়েদের। কারণ ঐ চালের ভাত করে, সেই ভাতে 'বাখর' মিশিয়ে মজতে দিলে তাকে নয়-দশ দিন সময় দিতে হবে, তবে মদ খাবার যোগ্য হবে। তা-ও আকাশের সূর্যের আলোর তারতম্য হলে মদ পাকতে দেরি হতে পারে। মেঘলা দিন হলে দশ দিন থেকে বেশি সময় দিতে হবে। আর মদ যদি তৈরি না হল তাহলে পরব হবে কি দিয়ে? কুটুমরা এলে তাদের কি দিয়ে আপ্যায়ন করা হবে?

মদ বা হাঁড়িয়া বা পচুই বা হুণ্ডি একই বস্তু এদের কাছে। বাবুরা যাকে মদ বলে সে হল এদের কাছে 'পাকি'। এ জিনিস পরবে চলে না। এই মদ না পাকার জন্য পরবের দিন পিছিয়ে দিতে আমিই দেখেছি। নিমন্ত্রণ করেছে, গিয়ে দেখি উৎসবের কোনো প্রস্তুতি নেই। ব্যাপার কি? না মেঘলা দিন চলাতে মদটা পাকল না, দুদিন পরব পিছিয়ে দিতে হল।

শোনা যায়, আগে যখন সাঁওতালদের আর্থিক সচ্ছলতা ছিল তখন মাসাধিক কাল ধরে এই বাদনা পরব চলত। অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়াতে সেই পরব আজকাল শেষ করতে হয় চার পাঁচ দিনের মধ্যে। আমি পাঁচ দিনের বাদনা পরবই দেখেছি। আর্থিক অসচ্ছলতার অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে প্রধান হল ওরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার জন্য নিজস্ব চাষযোগ্য জমি বিশেষ কিছু এখন নেই। নতুন কোনো ডাঙায় যখন এসে ওরা বসতি করেছে, ডাঙা কেটে জমি তৈরি করেছে তখন হয়তো জমিদার একজন এসে সেই জমির আইনত দাবিদার দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ বা জমিদারের প্রজা হয়ে থেকেছে, তাদেরই যৎকিঞ্চিৎ জমি আজও নিজের বলে আছে। অতএব উৎসবের খরচ আসবে কোথা থেকে? তাছাড়া জমি-জেরাত চলে যাওয়াতে এখন তাদের মেয়েরাও পরের ঘরে কাজের জন্য যাচ্ছে। এটাকে সাঁওতালরা মনে মনে খুব অসম্মানজনক বলে মনে করে। তাই আজও ভাগচাষীর সম্মান অনেক। সে যেন স্বল্পদিনের জন্য হলেও, অর্ধেক ফসল পেলেও মনে করে সে একজন চাষী বটে। নিজের স্বামী চাষ করে ঘরে ধান আনছে, একথা ভাবতে সাঁওতাল বৌয়ের আজও কত গর্ব। কিন্তু সে সুযোগ আর ক'জনার হয়। আজকাল মেয়েগুলো কলে কাজ করতে যায়, সেখান থেকে কেউ দু'টো দিনের ছুটি (বিনা বেতনে) পায়, কেউ বা তাও পায় না! তখন যে কলে খুব জোর কাজ চলে, কামাই করলে বাবুরা রাগ করে, তাই তারা বাদনা পরবে ঘরে থেকেও আর পাঁচজনার সঙ্গে নাচে-গানে যোগ দিতে পারে না। —এসব খবর পেয়েছিলাম একটি গ্রাম থেকে, যখন তাদের প্রশ্ন করেছিলাম, 'তোমাদের গ্রামে কি চুলপাকা বুড়ি আর বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে ছাড়া যুবতী মেয়ে নেই, না তারা নাচ জানে না?'

প্রস্তুতি-পর্বের পর আসল অনুষ্ঠান যেদিন শুরু হল সেদিনের কথাই বলি। এই দিনের সকাল বেলার ব্যাপার দেখে মনে পড়ে

স্কুলের ছেলে-মেয়েদের সিদে তুলে বনভোজনের ব্যবস্থার কথা। সাত সকালেই শুরু হয় বাড়ি-বাড়ি চাল ডাল ইত্যাদি পূজার বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহের কাজ। আট-দশ জন কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে পূর্ণবয়স্ক জগমাঝির নেতৃত্বে এই কাজটি হয়ে থাকে। এই দলটি প্রতিটি গৃহস্থের বাড়ি যাবে। গৃহস্থও তৈরি থাকে তার দেয় সামগ্রীগুলি দেবার জন্য। এগুলি হচ্ছে, একটি বড়ো মুরগি বা বাচ্চা মুরগি, কিছুটা চাল ডাল, একটু লবন, দু'চারটি লঙ্কা, একটু হলুদ। সকলেই যে সব জিনিস দিতে পারে তা নয়। যে যা পারে দেয়, থাকতে দেবে না এমনটি হবে না। এজন্য যে কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম আছে তা নয়। কিন্তু দেখেছি, বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও সকলেই সাধ্যমত দেয়। এই সূত্রে এদের আচরণ দেখে মনে হয়েছে; এই দেবার তাগিদটা আসে নৈতিক দিক থেকে। এই থেকে ধারণা হয় যে, ওরা এখনো বিশ্বাস করে, থাকতে না দিলে অন্যায় হবে, পাপ হবে। এরা আধুনিক শিক্ষা পায় নি ; তাই বোধহয় এই কুসংস্কারটুকু (?) আজও ওদের মনের কোণে টিঁকে আছে এবং অনুষ্ঠানগুলি সমাজকে বেঁধে রাখতে সাহায্য করছে। প্রসঙ্গত বলে রাখি আমাদের দেখাদেখি বোধ হয়, ভাঙন শুরু হয়েছে।

লক্ষ্য করেছি মুরগি একটা দেবার প্রতি বেশি ঝোঁক গৃহস্থের। তাই যার মুরগি নেই সে কিছু অর্থ ধরে দেয়। যদিও খুব অসাধারণ ঘটনা, তবু কিছুই দেবার মত নেই এমনও গৃহস্থ দেখেছি। এমন অবস্থায় গৃহস্বামী চেষ্টা করে দু'চার আনা পয়সা দেবার জন্য। আবার তাও দিতে পারছে না এতো গরীব তাও দেখেছি। কিন্তু তাই বলে সে গ্রামের পরব থেকে বাদ যাবে না। অন্যান্যদের মতো সেও জগমাঝির কাছ থেকে পরবে অংশ গ্রহণ করার নিমন্ত্রণ পাবে।

এই সংগ্রহের কাজ শেষ হতে প্রায় দশটা বেজে যায়। এর পর গ্রামের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জমা হয় 'নায়েকে' অর্থাৎ পুরোহিতের বাড়ি। পুরোহিতের বাড়ি সংগ্রহ করা থাকে পূজার আনুষঙ্গিক যাবতীয় জিনিসপত্র। সেইগুলি সকলে মিলে ভাগাভাগি করে নিয়ে লাইন বেঁধে মাঝির নেতৃত্বে চলতে থাকে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানের দিকে, যেখানে আজকের পুজানুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। এই স্থানটি ওরা নির্বাচন করে ধান ক্ষেতে, মাঠে, গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে কোনো একটি পুকুরের কাছাকাছি।

জমিটা আগে থেকেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা থাকে, তারই একস্থানে 'নায়েকে' নির্বাচন করে নেয় 'গড়টেণ্ডী' বা পূজার স্থান। আর একধারে ঠিক করা হয় রান্নার জায়গা। এখানে দু'টি বড়ো বড়ো কাঠের জালের উনুন পাতা হয়। এই উনুনেই আজ সারা গ্রামের উপযোগী পূজার প্রসাদ বা খিচুড়ি রান্না করা হবে, যে সব উপকরণ সকালে গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি থেকে সংগৃহীত হয়েছে সেই সব দিয়ে এই প্রসাদ তৈরি হবে। সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ পুকুর থেকে জল আসছে, আর বন থেকে আসছে গাছের শুকনো জ্বালানি।

গড়টেণ্ডী হচ্ছে পূজার স্থান। কম-বেশি দুই ফুট চওড়া, তিন ফুট লম্বা জায়গায় মাটি সমান করে জল দিয়ে লেপে পরিচ্ছন্ন করা। সংক্ষেপে বলছি, এই পরিষ্কার জায়গাটার মধ্যে দুই লাইনে বাঁদিক থেকে ডান দিকে লম্বালম্বি কয়েকটা তিন সাড়ে তিন ইঞ্চি মাপের চৌখুপি করে নেওয়া হয়েছে, লবন দিয়ে। একইভাবে উপরের লাইনের তলায় আরো কতকগুলি চৌখুপি করা হয়েছে। এই চৌখুপি সংখ্যায় কতগুলি হবে তা নায়েকেরা আগে থাকতে সব সময় বলতে পারে না। আমি যতগুলো দেখেছি তার মধ্যে ষোলো থেকে আঠারোটি সংখ্যা পেয়েছি। এই ছোটো ছোটো চৌখুপি এক-একটি 'দেবতা বা বোঙাআর স্থান'। ঐ স্থানগুলিতে কিছু ভাঙা আতপ চাল রাখা হয়। নায়েকের পাশে সকালে সংগৃহীত মুরগিগুলি থাকে। সেখান থেকে আর একজন এক একটি মুরগি নায়েকের হাতে তুলে দেয়, নায়েকে তার মাথায় সিঁদুর দিয়ে এক পাঁচে কেটে তার রক্তটা একটা চৌখুপির মধ্যে অর্ঘ্য দেয়। নায়েকের সামনা-সামনি যে কয়জন বসে আছে তাদের মধ্যে দু'জন মন্ত্র পাঠ করে। এই দু'জনের মধ্যে অবশ্যই কুড়ুম-নায়েকে একজন। এইভাবে যতগুলো মুরগি আছে তাই দিয়ে একইভাবে চলতে থাকে পূজার্ঘ্য। সবশেষে পুরোহিত গড়টেণ্ডির দিকে পিছন ফিরে কিছুটা রক্ত মাখা মাটি ছড়িয়ে দেয় বোঙাআ বা দেবতাদের উদ্দেশে এবং উপবিষ্ট কয়েকজন মন্ত্রপাঠ করতে থাকে। এই হল পূজাপর্বের শেষ।

এই পর্বের শেষ হলে নায়েকে ছাড়া ঐ দলের বাকি সকলে চলে যায়। নায়েকে তখন একটি উনুন তৈরি করে এবং সেই উনুনে সে নিজের জন্য রান্না শুরু করে দেয়। মুরগিগুলোও ঐ আগুনে পোড়ানো হয় এবং প্রথমটা

এবং আরো কয়েকটা নায়েকের ভাগে রান্না করা হয়। বাকিগুলি ওদিকে সর্বজনের জন্য যে প্রসাদ বা খিচুড়ি তৈরি হচ্ছে তাতে দিয়ে দেওয়া হয়।

রান্না শেষে নায়েকে সবার আগে একাই আহার করে। তার আহার শেষ হলে ভোজ্য জিনিসের প্রায় অর্ধেক অংশ সে বাড়ি নিয়ে যায়। যাবার আগে তাকে হাঁড়িয়া বা মদ দেওয়া হয়। এই সময় নায়েকের বাড়ি যাবার কারণ হল, তার স্ত্রী কাল থেকে উপোস করে পূজার উপকরণ আতপ চাল ইত্যাদি তৈরি করেছে এবং সে এখনো উপবাসী রয়েছে। নায়েকের খাওয়া হলে সে বাকি খাবার হাতে নিয়ে স্ত্রীকে দেবে। তাই খেয়ে তার স্ত্রীর উপবাস ভঙ্গ হবে। কোনো স্ত্রীলোক বাদ্‌না পরবের প্রথম দিনের অনুষ্ঠান দেখতে মাঠে যেতে পারবে না। মেয়েদের পক্ষে এই অনুষ্ঠান দেখা নিষেধ।

ওদিকে গ্রামবাসীদের জন্য (কেবল পুরুষদের জন্য) যে প্রসাদ পাক করা হচ্ছে তার পাশে দ্বিতীয় উনুনটাতে এতক্ষণে একটি হাণ্ডায় জল গরম হচ্ছে। এই গরম জল গ্রাম থেকে আনীত মদের মণ্ডের সঙ্গে মিশিয়ে হাঁড়িয়া তৈরি হবে, যা দিয়ে উপস্থিত সকলকে আপ্যায়ন করা হবে।

উপরোক্ত সব কাজকর্ম শেষ হতে বেলা প্রায় তিনটে বেজে যায়। ততক্ষণে দু'জন-একজন করে লোক মাঠে জমতে থাকে। দু'একটি করে কয়েকটি মাদলও গ্রাম থেকে আসতে থাকে। একসময় শুরু হয় গান আর হাঁড়িয়া পান। ওদিক থেকে রাখাল ছেলেরা তাদের গোরু সমেত এসে জমা হয়। তাদের দেখা-দেখি নেংটা আধ-নেংটা শিশুর দলও জমতে থাকে।

একদিনের ঘটনা বলি। স্ত্রীলোকদের তো আজকের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া নিষেধ। কিন্তু দেখলাম কয়েকটি দশ-এগারো বছরের মেয়েও ছেলেদের দলে খেতে বসে গেছে। এর কারণ কি মাতব্বরদের কাছে যখন জানতে চাইলাম তাদের মধ্যে থেকে তখন কুড়ুম-নায়েকে খেদ করে বলল, 'কি করব বলুন, আজকাল সব বদ্‌লে যাচ্ছে। সবাই আমাদের কথা শুনছে না।'

এই সূত্র ধরে অন্য একজন মুরব্বি বলল, 'ছোটো ছেলে (মেয়ে) ওতে অত দোষ নেই।' এই ঘটনা হল উনিশশো সত্তর সালের।

এ সম্বন্ধে পরে আমি আরো কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি। পরিষ্কার দুটো মত চালু রয়েছে একই পরিবেশে। একদল কুড়ুম-নায়েকের মতকেই সমর্থন করে. এরা নিজে থেকে আলাদা করে বিষয়টা বিচার করতে চায় না। এদের মনোভাব হচ্ছে. নিয়ম যখন একটা রয়েছে, কি দরকার সে নিয়ম ভঙ্গ করা। অন্যদলের ঐ আর এক মত. ছোটো ছেলে (মেয়ে) দোষ নেই। যেটা আমার ধারণা হয়েছে. ছোটো ছেলে বলতে তারা বোঝাতে চাইছে যে ঐসব মেয়েদের ঋতুমতী হবার বয়স হতে এখনো অনেক বাকি, তাই দোষ নেই। আমার এ ধারণার মৌখিক সমর্থন যা পেয়েছি তা এখনও সন্দেহাতীত নয়। তবে যদি 'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্' বলে ধরা হয়, তাহলে আমার এ ধারণাই সঠিক বলা যায়।

ইতিমধ্যে বড়োদের আসরে সমানে হাঁড়িয়া পান চলছে. গান হচ্ছে. মাদল বাজছে আর ফাঁকে ফাঁকে কুড়ুম-নায়েকে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করে কিছু বলছে। আবার মাদল বাজছে, গান হচ্ছে, হাঁড়িয়া চলছে। এইভাবে যতক্ষণ না ছোটোদের খাওয়া শেষ হয় এবং বড়োদের খাওয়ানোর জোগাড় হয় ততক্ষণ চলতে থকে। খাওয়ার ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান হ'ল কাঁচা শালপাতার তৈরি পান-পাত্র ছাড়া বেশ কয়েকজন নিয়ে আসে কাঁচের গ্লাস। এলুমিনিয়ম ও কাঁসার গ্লাসও কেউ কেউ নিয়ে আসে। স্টেনলেস স্টিলের গ্লাসও দু'জায়গায় দেখেছি। সেই সঙ্গে আবার থাকে সম্পূর্ণ মুখ খোলা টিনের কৌটো। একটা গ্রামের বাদ্না পরবে দেখেছি শালপাতার বদলি মহুয়া পাতার ব্যবহার। কোনো বিশেষ কারণ আছে বলে তারা স্বীকার করে নি। কিন্তু আমার মনে হয় আছে। কারণ এটা যদি এমনি সাধারণ কাজের জন্য হ'ত তাতে বলার কিছু ছিল না. একই বাদ্না পরব উপলক্ষ্যে অর্থাৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যখন ব্যবহার হচ্ছে তখন এর মধ্যে একটি বিশেষ কারণ থাকতেই পারে। এ নিয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করে দেখতে পারিনি এখনো। সকলেরই যে আলাদা আলাদা পান-পাত্র থাকে তা নয়। একটা পাত্র একাধিক জন যখন ব্যবহার করছে তখন প্রত্যেকবার পাত্‌নায় রাখা জল দিয়ে আলগোছে ধুয়ে নেয়।

ছোটোদের খাওয়া যখন শেষ হয় তখন জায়গাটা ভালো করে

পরিষ্কার করে নেওয়ার পর বড়োদের খাবার ব্যবস্থা হয়। এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করার মতো। মাতব্বররা যেখানে বসেছিল, গান গল্প ইত্যাদিতে মশ্‌গুল ছিল তারা কিন্তু তাদের জায়গা ছেড়ে পঙ্‌ক্তিবদ্ধ কোনো বারেই হয় না। অন্যরা পঙ্‌ক্তি করে তাদের সঙ্গে যুক্ত হবে নয়তো ওরা আর সাধারণের থেকে আলাদাই থেকে যাবে। বড়োদের খাওয়া শেষ হলেই সকালে যে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল মনে হবে তার শেষ হল। কিন্তু তা নয়। এর পরেও আর একটি অনুষ্ঠান আছে। সেটা আজকের সঙ্গে একটু বেখাপ্পা মনে হলেও সমস্ত 'সোহরাই' পরবের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। অর্থাৎ পৌষের পরবের সঙ্গে মাঘ মাসে যে 'সোহরাই' পরব হবে তার সঙ্গে আজকের শেষের অনুষ্ঠানটির বিশেষ যোগ আছে।

প্রসাদ বিতরণের শুরু থেকেই রাখাল ছেলেরা যে যার গোরু-ভেড়া সব নিয়ে 'গড়টেণ্ডী' থেকে দূরে একধারে জড়ো করে, চারদিকে পাহারা দিয়ে তারা ওদের ঘিরে রাখে। ইতিমধ্যে সকলের প্রসাদ পাওয়া যখন হয়ে যায় তখনই আজকের শেষ অনুষ্ঠানটি শুরু হয়. এইসব রাখাল বালক ও তাদের গরুর দল নিয়ে। গড়টেণ্ডীর একপাশে একটি মুর্গির ডিম কুলো ঢাকা দিয়ে রেখে দেওয়া থাকে, আগে থেকেই। রাখাল ছেলেদের কাছ থেকে কয়েকটি পাচনবাড়ি সংগ্রহ করে নেয় নায়েকে। একজন রাখালকে ঐ ঢাকা দেওয়া ডিমটিকে পিছনে রেখে নায়েকে বসালো। নায়েকে এক-একটি পাচনবাড়ি বালকটির পিঠের দিকে তুলে ধরে আর রাখাল বালকটি পিছনে না তাকিয়ে দুই কানের পাশ দিয়ে পিছনের পাচনবাড়িগুলি এক-একটা করে নির্ভুলভাবে তুলে নিয়ে সামনে রাখে। এরপর ঘুরে দু'জনে দু'জনকে 'জোহার' (অভিবাদন) করে। রাখাল ছেলেটি এরপর সমবেত সকলের উদ্দেশে জোহার করে। তখন বাকি রাখাল ছেলেরা চারিদিক থেকে গোরুগুলোকে এমনভাবে তাড়িয়ে আনে যাতে ডিম-টির ঢাকনা খুলে দিলে সহজেই গোরুদের নজরে পড়ে এবং ডিমটি কোনো একটি গোরু খেয়ে ফেলে। এই সময়ে খুব জোরে মাদল বাজানো হয়, বেশ একটা সোরগোলের সৃষ্টি হয়। যে গোরুটি ঐ ডিমটি খাবে সেই গোরুর বাগালকে আর সকলে কাঁধে নিয়ে সানন্দে

মাদল বাজাতে বাজাতে গ্রামের দিকে রওনা হয়। রাখালটিকে এতো সম্মানিত করার তাৎপর্য গোরুর মালিকের আগামী মরশুমে খুব ভালো ধান হবে— এরূপ বিশ্বাস।

বলা চলে এইখানেই বাদ্না পরবের প্রথম দিনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের শেষ। শেষ আজকের দিনটারও, কেননা, সূর্যাস্তের সময়েই অপূর্ব আলোকিত পরিবেশে এই শেষ অঙ্ক সমাপ্ত হয় ধান ক্ষেতের ধর্ম-মঞ্চে।

পরবের দ্বিতীয় দিনে বিশেষ বাহ্যিক বৈচিত্র্য নেই। সকাল থেকে গ্রাম জুড়ে নিস্তব্ধতা নীরবতা রাজত্ব করতে থাকে। একটু বেলা হলে সাধারণ কাজকর্ম চলে বটে কিন্তু কোথাও কোনো চঞ্চলতা বা তৎপরতা থাকে না। কিন্তু কিছু কিছু কর্মতৎপরতা দেখা যাবে কোনো কোনো গৃহস্থের বাড়ির ভিতরে গেলে। আজকের দিনের পরবের তাৎপর্য হল, ব্যক্তি অর্থাৎ গৃহস্থবিশেষের স্বাধীনতা। প্রথম দিনে যা কিছু হয়েছে সবই সারা গ্রামের হয়ে। কোনো গৃহস্থ আলাদা করে কিছু করেনি। আজ তার ঠিক উল্টো। আজকে সন্ধ্যার আগে কেউ কারো বাড়ি যাবেই না, যদি না কেউ নিজ আত্মীয় হয়। শুধু পড়শি হিসাবে কারো বাড়ি যাওয়া, না— তা হবে না। প্রায় সারাটা দিন বাড়ির লোকজন নিয়ে, আত্মীয়স্বজন নিয়ে গৃহস্থ মসগুল থাকে। চলে খাওয়া-দাওয়া ও হাঁড়িয়া পান।

আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনীসহ আসবে এ-বাসনা প্রত্যেক মা-বাবার মনে থাকে ; এবং মেয়েরাও মনে সারা বছর ধরে ইচ্ছা পোষণ করে রাখে বাদ্না পরবে সে ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্বামীর সঙ্গে মা, বাবা, দাদার বাড়ি যাবে। মেয়েদের ছেলে-মেয়েরা বড়ো হয়ে গেলে অন্ততপক্ষে একটা কি দুটো দিন ঘুরে যায়, নিজের ঘরে ফিরে সেখানেও কর্তব্যপালন করে। বেশি বয়স হলে এই আসা-যাওয়া আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়।

এদিন সন্ধ্যার পূর্বকাল পর্যন্ত ঐ অবস্থা চলে। তারপর পট-পরিবর্তন হয়। তখন বাড়ি বাড়ি থেকে মাদলের আওয়াজ ওঠে আর ঘর থেকে মেয়েরা সেজে গুজে 'কুলি'তে (গ্রামমধ্যস্থ প্রধান রাস্তা) বেরিয়ে পড়ে। পুরুষরা বাজায় মাদল আর বাঁশি, আর মেয়ের দল পরিবেশন করে নাচ ও গান। এই সচল দল 'কুলি'র

একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নেচেগেয়ে বেড়াতে থাকে। ওদিকে বাড়িতে তখন চলে জোর আড্ডা, আর হাঁড়িয়া ও চাট্ ; যার যেমন জোটে। এরূপ দৃশ্য অনেকের দেখা ; কাজেই আমি এইখানেই ছেদ টানছি।

তৃতীয় দিনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে বলা হয় খুন্টৌ।

এই দিনের অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক দিক থেকে এতই তাৎপর্যপূর্ণ যে এটি একাই যে কোনো পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানের সমকক্ষতা দাবি করতে পারে। এই দিনের অনুষ্ঠান প্রমাণ করে দেয় যে, এই সাঁওতাল জাতি চাষ-আবাদ গৃহস্থালির সঙ্গে কত গভীরভাবে কোন্ আদিকাল থেকে সম্পৃক্ত। এদিনের যাবতীয় অনুষ্ঠান গোরু ও ধান-চাষকে কেন্দ্র করে। গোয়ালঘরে গো-পূজা হচ্ছে এদিনের প্রধান অনুষ্ঠান। অল্পের মধ্যে বলার চেষ্টা করছি।

আজকের খুন্টৌ পূজা সব বাড়িতে হয় না। চাষের দুরবস্থা খুব সম্ভবত এ'জন্য দায়ী। তবে যে-কোনো সম্পন্ন গৃহস্থ এই পূজার ব্যবস্থা করে থাকে। সম্পন্ন চাষী হোক বা না হোক নায়েকের বাড়ী খুন্টৌ পূজা হবেই। এই পূজার প্রধানা হচ্ছে বাড়ির কর্ত্রী। সকাল থেকে গোরুগুলো সব গোয়ালঘরে বন্ধ থাকে। একটু বেলা হলে, যেমন বেলা আটটা সাড়ে আটটা, পূজাপাট শুরু হয়। উপকরণ ধান, দূর্বা, সিঁদুর, কাঁচা শালপাতা দিয়ে তৈরি জ্বলন্ত প্রদীপ, সবকিছু কুলোর উপরে সাজিয়ে নিয়ে গোয়াল ঘরের দরজা খুলবে বাড়ির কর্ত্রী। তার কণ্ঠে গান ; বাঁ হাতে ডালা। ডান হাত দিয়ে ডালা থেকে ধান নিয়ে সেই ধান গোরুদের উপর ছিটোয় আর গান গায়। প্রত্যেকটি গোরুকে এইভাবে গান গেয়ে পূজা করা হয়, তাদের কপালে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে দেওয়া হয়। গানের বিষয়বস্তু, বিষয়ান্তরে ভিন্ন হলেও গৃহস্থের সৌভাগ্য কামনাই এখানে প্রধান। যেমন, একটি গানে বলা হচ্ছে : (বলদে) ভালো হাল চষবে, ভালো ধান হবে। অন্য একটিতে : (গাই) গোয়াল-ভর্তি বাছুর হবে, গাইয়ের প্রথম বাছুর বক্না হবে। ইত্যাদি।

এই সঙ্গে ঠাট্টা মস্করাও চলে খুব। যেমন একটি গান গেয়ে বলা হ'ল :

বউটা বাড়ির সব কাজ করে / মাঝি তুই তার পূজো কর...

গোয়ালঘরের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান—

এই অনুষ্ঠানও সব বাড়িতে হতে দেখি নি। নায়েকের বাড়িতেই হতে দেখেছি। তবে অন্যরা করতে পারে, তাতে বাধা নেই কিছু। এখানে বাড়ির কর্তা হচ্ছে প্রধান। সে হাত-পা ধুয়ে শুচি হয়ে একটি জামবাটিতে এক বাটি মদ নিয়ে গোয়ালে ঢুকবে। সেখানে সর্বপ্রথম একটি বকনা বাছুরকে আঙ্গিক করে পূজার প্রথম অনুষ্ঠান হবে। একটি শালপাতার পাত্রে (ভাউচিটে) মদ ভরে নিয়ে সেটি বাছুরের পাশে রাখবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে মন্ত্রপাঠ করবে। এর পর একটি একটি করে পাত্রে মদ ঢেলে মন্ত্রপূত করে প্রথম পাত্রটির পাশে রাখতে থাকবে। প্রত্যেক বার মন্ত্র পড়ার মধ্যে মারাংবুরুর (দেবতার নাম) নাম থাকবেই। সব শেষে মদের ধারা দিতে দিতে মন্ত্র পড়বে এবং ধারা শেষ হলে প্রণাম করবে। তখন উপস্থিত সকলে যারা গোয়াল ঘরে প্রবেশাধিকার পেয়েছে তারাও সকলে প্রণাম করবে। এইখানেই পূজাপর্ব শেষ হবে।

পূজা শেষ হলে ঐসব পাত্রের মদ এবং জামবাটির অবশিষ্ট মদ পুরোহিত নিজে পান করবে এবং পরিবারের যে যে পূজাতে থাকবে তাদের সকলকে দেবে, তারা সকলে পান করবে। মনে হয় এটি পূজার প্রসাদ হিসাবে তারা গ্রহণ করল। এরপর পাত্রগুলি তুলে নিয়ে বাইরে ফেলে দেবে। এখন প্রথমে গাই-গোরুটির শিঙে তেল মাখাবে। এ তেল নারকেল তেল। পরে বাকি সব গোরুর শিঙে তেল মাখিয়ে দেবে।

এই পূজা অনুষ্ঠানে গোরুদের ছাড়া পূজারীর ঠাকুরদা থেকে শুরু করে বংশের যত জন মারা গেছে তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশে একটি করে মদের ডালি দেওয়া হয়। তাছাড়া পাহাড়ের নামে একটি, আর যাদের নাম জানা নেই তাদের উদ্দেশে একটি ডালি দেওয়া হবে। মোট ডালির সংখ্যা হবে কিন্তু বিজোড়।

এই আঙ্গিকে শেষ অনুষ্ঠান— গোয়ালের বাইরে তিন আঁটি ধান একসঙ্গে বেঁধে তেঠেঙ্গা করে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। ভিতরে যে সব বলদ আছে তাদের মাথায় একগুচ্ছ করে ধান বেঁধে দেওয়া হবে। গোয়ালঘরের দরজা খুলে দিলে বলদ গোরুরা বেরিয়ে ধানে মুখ দেবে। সেই ধান ঐ বাড়ির লোক ছাড়া তাদের যে কোনো আত্মীয় উপস্থিত থাকবে সে পাবে। এরপরে রাখালছেলেরা বাকি গোরুদের নিয়ে মাঠে

যাবে, অর্থাৎ এখন থেকেই আবার তাদের মুক্ত জীবন শুরু হবে।

অনুষ্ঠান শেষ হলে মেয়েরা ঢুকবে গোয়ালঘরে, পরিষ্কার করতে। আজ কিন্তু গোয়াল পরিষ্কারে ঝাঁটা ব্যবহার করা চলবে না। সব কিছু হাত দিয়েই করতে হবে।

এখন শুরু হবে পানীয় বনাম হাঁড়িয়া বণ্টন। যারা উপস্থিত আছে সকলকে এই মদ দিয়ে আপ্যায়ন করাই রীতি।

এদিন পূর্বাহ্নে আর কোনো কাজ নেই। আবার শুরু হবে সারা গ্রাম মিলে নাচ, গান, বাদ্য আর হাঁড়িয়া পান। সব বাড়ি বাড়ি পানের আসর জমে উঠবে। আজ একজন আর একজনের বাড়ি অবাধে যাতায়াত করবে এবং যার বাড়িই যাক গৃহস্থ তাকে মদ খেতে দেবে। বাড়ির বৌরাই সাধারণত মদ পরিবেশন করে। খেতে দিলে সেটা গ্রহণ করাই নিয়ম। আজকে নাচ গানের পালার যেন আর শেষ নেই। অনেক গ্রামে গভীর রাত পর্যন্ত মাদলের বাদ্য আর গানের সুর শীতের রাতের বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসতে শোনা যায়। গভীর রাতে ঘরের মধ্যে নাচ থাকে বন্ধ। গ্রাম তখন ঘুমে ও নেশায় অচৈতন্য বললে অত্যুক্তি হয় না।

আজ পরবের চতুর্থ দিনে। আজকের দিনটা ওদের আরম্ভ হয় কিছু দেরিতে। সাঁওতালরা সাধারণত সূর্যোদয়ের বেশ কিছুটা আগে থাকতেই ঘুম থেকে ওঠে এবং ঐ প্রত্যূষেই মেয়ে পুরুষ নির্বিচারে কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাইরে যাওয়ার তাড়া না থাকলে বাড়ির দাওয়ায় বসে পুরুষদের আড্ডা দিতে বড়ো একটা দেখা যায় না। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই সকালের আড্ডা দেওয়ার অভ্যাস কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে।

আজ কিন্তু এরা সকলেই বেশ দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে এবং দেখে মনে হয় ওদের জন্য যেন সময়টা আজ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। আজকে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান নেই, কাজেই তাড়াও নেই কিছু। তবে বেলা দশটা নাগাদ কুঁড়েমি ঝেড়ে ফেলে মাদলে একবার আওয়াজ তুললেই তখন নাচের দল বেরিয়ে পড়ে। বাচ্ছা ছেলেমেয়েরা মনের আনন্দে নিজেরাই দল তৈরি করে বড়োদের নকল করে নাচ বাজনায় লেগে যায়, আর বুড়ো ও বয়স্করা কোনো বাড়িতে একবার দল বেঁধে বসে গেলে হাঁড়িয়ার শ্রাদ্ধ

করে এবং বেপরোয়া আড্ডা মারে। এই সময় ঠাট্টা সম্পর্কের মেয়ে পুরুষের মিশ্র দলের মধ্যে যে মস্করার স্রোত বয়ে যায় তা দেখলে সত্যিই অবাক লাগে। যে সাঁওতালদের স্বভাবতই শান্ত এবং বাক্‌সংযমী বলে আমরা জানি তারা যে কত বাক্‌পটু এবং হাসি-ঠাট্টায় কত অসংযমী হতে পারে তা না দেখলে ধারণাই করা যাবে না। আজ সারাদিন কখনো বেশি কখনো কম এইভাবে চলতে থাকে ওদের উৎসব। শেষ হয় বেশ রাত করে। সন্ধ্যারাতেই জমে সবচেয়ে বেশি। নাচ আর গান, সঙ্গে থাকে বাজনা মাদল ও বাঁশের বাঁশি।

পঞ্চম বা পরবের শেষ দিনে নাচ গান ছাড়া দু'তিনটি অনুষ্ঠানও পালিত হয়। যেমন 'সেন্দ্রা' বা শিকারে যাওয়া, লক্ষ্যভেদ বা বেজ্‌হা ও খেলাধূলা। প্রথমটিতে বয়স্ক পুরুষরা এবং যুবকরাই বেশি যোগ দেয়। সকলে মিলে শিকারের জিনিস নিয়ে বনে-বাদাড়ে চলে যায়। আজকাল এই সঙ্গে মাছ ধরার জিনিসও নিয়ে যায়। শিকার করার মতো জায়গা অর্থাৎ বনবাদাড় দিন দিন কমে যাচ্ছে, ভাগ্য ভালো থাকলে বড়োজোর দু'একটা বুনো খরগোস মেলে, নয়তো বেশির ভাগ শিকার হয় নদী, নালা, ক্যানেল ইত্যাদিতে যা মাছ ইত্যাদি পাওয়া যায় তাই ধরে নিয়ে আসে; নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এই সঙ্গে বাজনা-বাদ্যি দেখা যায় না, তবে গান থাকে। ফেরার সময় বেশ সোরগোল করে ফেরে। একটি জিনিস লক্ষণীয়, শিকার করতে যাবার সময় এরা হাঁড়িয়া নিয়ে যায় না। ফিরে এসেও সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়িয়ার কলসি নিয়ে বসে না।

শিকারের পালা চুকলে শুরু হয় লক্ষ্যভেদের প্রস্তুতি। ওদের ভাষায় যার নাম 'বেজহা'। সামনে বেশ খানিকটা দূরে থাকে লক্ষ্যবিন্দু। ঐ লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। লক্ষণীয় এরা বুড়ো আঙ্গুল চেপে তীর ধরে না। এই সঙ্গে লাঠি খেলাও কোনো কোনো জায়গায় হতে দেখেছি। আবার একই সঙ্গে ফুটবল খেলাও হতে দেখলাম। এইটি আজকের এবং পঞ্চম দিনের বাদ্‌না পরবের শেষ অনুষ্ঠান।

এই অনুষ্ঠান শেষে নিয়ম এক বাড়ির লোকে অন্য বাড়িতে একে একে যাবে এবং পরস্পরকে অভিবাদন জানাবে। এর নাম 'জালে'। 'জালে'

দেখলে মনে করিয়ে দেয় হিন্দুদের দুর্গাপুজোর শেষ দিন বিজয়া-দশমীর কথা। পুত্র-কন্যা ও স্বামীকে নিয়ে পিত্রালয়ে আসার যে রীতি দুর্গাপুজোর সঙ্গে বাদ্‌নার সে অনুষঙ্গও কম চিত্তাকর্ষক নয়। এইজন্যই বোধহয় বাদ্‌না পরব কত বড়ো পরব তা বোঝাবার জন্য ওরা বলে, 'তোমাদের যেমন দুর্গাপুজো আমাদের তেমনি বাদ্‌না।'

সবশেষে একটি কথা বলে রাখি, অনেকে মনে করেন এই অনুষ্ঠান হল 'সোহরাই' পরবের শেষ পরব। সে কথা কিন্তু ঠিক নয়। 'সোহরাই'এর আরো পরব আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

মাঘ-সিম্‌ বা মাঘ-সোহরাই পরব

প্রথম অধ্যায়ে সাঁওতালি সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামোটা কিরূপ তার বিবরণ দিয়েছি। তার সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানের সম্পর্ক দেখানোর জন্য সাঁওতালদের সবচেয়ে বড়ো পরব 'বাদনা'র উল্লেখ করেছি দ্বিতীয় অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে বাদ্‌না পরবের সঙ্গে সম্পর্কিত আর একটি পরব, মাঘ-সিমের কথা বলব। মনে রাখতে হবে মাঘ-সিমের অন্য নাম মাঘ-সোহরাই ; অর্থাৎ মাঘ-সিম্‌, সোহরাই পরবের অন্তর্ভুক্ত আর একটি পরব। এই কারণেই দুইটি পরবের (বাদ্‌না ও মাঘ-সিম্‌) ধর্মানুষ্ঠান, আচার-বিচার ইত্যাদির মধ্যে অনেক মিল আছে। আবার যেহেতু মাঘ-সিম সোহরাই-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েও একটি ভিন্ন পরব, তাই এর সঙ্গে বাদ্‌না পরবের অনেক ক্ষেত্রে ভিন্নতাও আছে। আগ্রহী পাঠকের কাছে তাই এই পরবটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে আশা করি।

এখানে আমি এই মাঘ-সিম্‌ পরব কখন কিভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেই বিবরণ আগে দেব এবং শেষের দিকে সাঁওতালদের সমাজব্যবস্থার মধ্যে এর গুরুত্বের কথা উল্লেখ করব।

বাদ্‌না পরবের মতোই মাঘ-সিম্‌ পরবের দিন ধার্য হয়ে থাকে। বাংলা মাঘ মাসের মধ্যেই, সাধারণত মাস শেষের কয়েকদিন আগেই এই পরব শেষ হয়। পরবটি মাত্র একদিনের।

বাদ্‌না পরবের মতোই পরবের দিন সকালে বাড়ি বাড়ি থেকে দ্রব্যাদিসংগ্রহ করা হয়। এইসব দ্রব্যের মধ্যে মুরগি, বিশেষ করে বাচ্চা মুরগিই বেশি। অন্যান্য বিষয়ে বাদ্‌না পরবের সময় সংগৃহীত দ্রব্য থেকে কোনো পার্থক্য নেই।

সকালে এই দ্রব্য-সংগ্রহ অনুষ্ঠান ছাড়া আর একটি অনুষ্ঠান হয়। এটা মাঘ-সিম্‌ পরবের বিশেষ অনুষ্ঠান। অতএব এই অনুষ্ঠানটি সম্বন্ধে একটু বিশদ বিবরণ এখানে দিচ্ছি।

এই অনুষ্ঠানটি হয় মাঝিস্থানে। মাঝিস্থান হচ্ছে, সর্দার বা মাঝির বাড়ির সামনে ফাঁকা জায়গায় আন্দাজ দশ বর্গফুট পরিমিত ছয় ইঞ্চি

উচ্চ একটি চতুষ্কোণ বেদী, মাটি দিয়ে তৈরি। এই বেদীকে ঘিরে পূজার সরঞ্জাম তৈরি রাখা হয়। সরঞ্জামের মধ্যে থাকে— বলির জন্য পক্ষী, সিঁন্দুর, জল ও আতপ চাল। বস্তুগুলি লেপা-পোঁছা বেদীর তিন দিকে সাজিয়ে রাখা হয়। বেদীর তিন দিক ঘিরে কয়েকজন সাঁওতাল পুরুষ বসে থাকে। এরা হল গ্রামের কর্মকর্তা-ব্যক্তি। এই ব্যক্তিদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের অগ্রণী ব্যক্তি হচ্ছে কুডুম-নায়েকে; অর্থাৎ যাকে বলা হয় পাঁদাড়ের পুরুত বা যে ব্যক্তি ক্ষতিকারী বোঞআদের সঙ্গে সমাজের হয়ে মোকাবিলা করে। কুডুম-নায়েকের সাহায্যকারীদের মধ্যে মাঝি বা সর্দার প্রধান। তাছাড়া গোড়েৎ, জগমাঝি, পারাণিক, জগ-পারাণিক প্রভৃতিও আছে। লক্ষণীয় যে, এই অনুষ্ঠানে নায়েকের বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই।

ঐসব পক্ষীদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে মুরগি ছোটো ও বড়ো দুই-ই। তাছাড়া এই সঙ্গে পায়রাও থাকে। এই পক্ষীগুলিকে বলি দেওয়ার আগে যথারীতি শুদ্ধ করে নেওয়া হয়; মাথায় জল দিয়ে, কপালে সিঁদুর দিয়ে উৎসর্গ করা হয়। একটু আতপ চাল ওদের ঠোঁটের কাছে ধরা হয় এবং তারা দু'একটা খায়ও। সাধারণত এক একটি পক্ষীকে এক এক প্যাঁচে কেটে তার কিছুটা রক্ত বেদীর উপর নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে পাখিটাকে পাশের লোকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু একসঙ্গে দুটো পায়রা এক প্যাঁচে কেটে বলি দেওয়া হয়েছে এমনও দেখেছি। এইসব অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে কুডুম নায়েকে মন্ত্রপাঠ করতে থাকে। পক্ষীগুলি বলি দেবার পর খড়ের আঁটির মধ্যে ভরে সন্তর্পনে ভালো করে বেঁধে রাখা হয়। মনে হয় যাতে ধুলো-বালি লাগতে না পারে বা মাছি ইত্যাদি বসতে না পারে তারই জন্য এই সাবধানতা।

এগুলি গ্রামবাসীদের বিভিন্ন সময়ের মানত্‌করা জীব। সারা বছরের মধ্যে কেউ বিপদ-আপদ কাটানোর জন্য কোনো না কোনো বোঞআর কাছে মান্‌সিক করেছিল। এই সময়ে সেই সেই মান্‌সিক সেই সেই বোঞআর নামে উৎসর্গ করে ব্যক্তি তার ঋণ শোধ করে নিশ্চিন্ত হল।

ব্যক্তিবিশেষের বা পারিবারিক মানত্‌ ছাড়া সমস্ত সমাজ বা গ্রামের পক্ষ থেকেও অনেক সময় মানত্‌ করা হয়। যেমন সেবার পিয়ার্সন-

পল্লীতে দেখা গেল একটি নিখুঁত কালো বুচকুচে পাঁঠাকে বেদীর একপাশে আটক থাকতে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল— গতবছর যখন ঘরে ঘরে গোরুর অসুখ হচ্ছিল তখন গ্রামের সকলে ভয় পেয়ে যে বোঞ্ঞআর ক্রোধের ফলে এরূপ হতে পারে (কুড়ুম-নায়েকে তা জানতে পারে) সেই বোঞ্ঞআর নামে ঐরূপ মানত্ করা হলে (সারা গ্রামের পক্ষে) গোরুব ঐ মারাত্মক ব্যাধি আর বাডতে পারে না, এবং শেষে সব গোরুই ভালো হয়ে যায়। তবে এই পাঁঠা মাঝিস্থানে বলি হল না ; সেটাকে বলি দেওয়া হল মাঠে, মাঘ-সিমের প্রধান পূজা-স্থানে, যেখানে গ্রামের পুরোহিত অর্থাৎ নায়েকে হচ্ছে প্রধান পূজারী।

আগেই বলেছি এই পরব মাত্র একদিনের। সূর্যোদয় থেকে শুরু আর শেষ হতে রাত্রি। সকালে মাঝিস্থানে ঐ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা শুরু হয় মাঠের অনুষ্ঠানের উদ্দেশে। একটা কথা এখানে বলে রাখি, মাঘ-সিমের মাঝিস্থানের অনুষ্ঠানে যদিও সরাসরি স্ত্রীলোকদের কোনো যোগ নেই, তবু এই অনুষ্ঠান দেখতে তাদের বাধা নেই। কিন্তু এই পর্বের পর, দ্বিতীয় পর্বে যে অনুষ্ঠান মাঠে অনুষ্ঠিত হবে সেটা স্ত্রীলোকদের দেখা নিষেধ। তাই মাঝিস্থানের অনুষ্ঠানের পর দ্বিতীয়-পর্বের অনুষ্ঠানের জন্য যে যাত্রা শুরু হল তার মধ্যে কেবল পুরুষরাই থাকবে। এই দলে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অবশ্যই থাকবে। তারাই পূজার বিভিন্ন সামগ্রী বয়ে নিয়ে যাবে মাঠে। যেখানে 'গডটেণ্ডি'র জন্য জায়গা ঠিক করা হয়েছে। পূজার সামগ্রীর মধ্যে থাকবে সকালের সংগৃহীত খাদ্য দ্রব্যাদি, মাঝিস্থানে পূজায় বলি দেওয়া পক্ষীগুলি এবং সারা গ্রামের একসঙ্গে মানত-করা কোনো বস্তু যদি থাকে তা-ও।

যদিও মাঠে গড়টেণ্ডিতে পূজোটা বাদ্না পরবের কথাই সর্বাগ্রে মনে করিয়ে দেয়, এক কথায় বাদ্না পরবের অনুষ্ঠানের মতোই সব, কিন্তু যেসব পাঠক বিশেষভাবে এ বিষয়ে আগ্রহী হবেন তাঁদের জন্য আমি এই গড়টেণ্ডির পূজার হুবহু একটি চিত্র এখানে তুলে ধরছি।

"নায়েকে একটি লেপা-পোঁছা জায়গার উপর ভাঙা-ভাঙা আতপ চাল দিয়ে মোট নয়টি বড়ো চৌখুপী বানাল। একটি চৌখুপীকে মাঝে চালের লাইন দিয়ে দু-ভাগ করল। প্রত্যেকটি ঘরে কয়েকটি করে আতপ চাল রাখল এবং দুটো করে সিঁদুরের টিপ্ দিল। খাঁড়াটা জল দিয়ে ধুয়ে

একপাশে রাখল। পাশে বসে থাকা এক ব্যক্তি তার জিম্মায় থাকা খালুই থেকে একটি মুরগির বাচ্চা বের করে নায়েকের হাতে দিল। নায়েকে ঐ বাচ্চাটির মাথায় সিঁদুর দিল, একটু জলের ছিটে দিল; মুরগিটাকে ধরে তার মুখটা প্রথম চৌখুপীর মধ্যে যে চাল রাখা আছে সেখানে ঠেকাল। মুরগি সেই চাল খেল। কুড়ুম-নায়েকে মন্ত্র পড়ল। নায়েকে মুরগিটি একপঁ্যাচে কেটে গড়টেণ্ডীর বামদিকের প্রথম চৌখুপীর মধ্যে রাখল। এইভাবে আর একটি মুরগি কেটে ঐ প্রথম চৌখুপীর মধ্যেই রাখল। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মুরগি তিনটি পরপর কেটে তাদের মুণ্ডুগুলো পাশে রাখল, ধড়গুলো সামনে বসে থাকা এক ব্যক্তির দিকে ছুঁড়ে দিল। সেই ব্যক্তি ওগুলো ধরে বসে রইল। ষষ্ঠ মুরগিটা বলি দিয়ে, ধড় থেকে বেরোনো টাট্‌কা রক্ত খানিকটা গড়টেণ্ডির দ্বিতীয় চৌখুপীর মধ্যে নিয়ে ধড়টা সামনের ব্যক্তিটির দিকে ছুঁড়ে দিল। সপ্তম মুরগিও ঐ একই ভাবে বলি দিল এবং কয়েক ফোঁটা রক্ত নিয়ে ধড়টা সামনের লোকটিকে দিয়ে দিল। অষ্টম মুরগিটিকে দু'বার সিঁদুর দিল, চাল খাওয়াল এবং দু'বার তার উদ্দেশে মন্ত্রপড়া হল। নবম মুরগিকে বলি দিয়ে গড়টেণ্ডির সর্বদক্ষিণের চৌখুপীর মধ্যে একটি শালপাতায় কিছু চাল দিয়ে সেই চালের উপরই ধড়ের রক্ত দিয়ে মন্ত্র পড়ে অনুষ্ঠান করল। নায়েকে চৌখুপীর শালপাতার উপর কাটা মুরগিটিকে ডান হাতে ধরে রেখে তার নিজের মুখটা ডান দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বাঁহাত দিয়ে কিছু চাল ও জলের অর্ঘ্য দিল, মন্ত্র পড়ল। এইটাই হোল গড়টেণ্ডীর পুজানুষ্ঠানের শেষ দফা।"

এই যে ধারাবাহিক রিপোর্টটি আমি তুলে দিলাম এর মধ্যে একটি বলিকৃত মুরগির ক্ষেত্রে ক্রিয়া-কলাপের কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সেগুলি সবিশেষ জানবার জন্য চেষ্টা করে দেখেছি; আমাকে জানাবার পথে ওদের বেশ মানসিক বাধা আছে। সোজাসুজিভাবে অর্থাৎ স্বেচ্ছায় ঐসব গূঢ়তথ্য আমাকে জানালে সেটা অন্যায় (পাপ) হবে বলে ওদের বিশ্বাস। তবে কথার পিঠে কথার মাধ্যমে যেটুকু জানতে পেরেছি তাতে আমার মনে হয়েছে: এইসব অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছে ওদের দেবতা (বোঙ্গা) অপদেবতাদিগকে তুষ্ট করার, তাদের ক্রোধের কারণ না হওয়ার উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে। এইসব বোঙ্গা-প্রসূত ভয়-ভাবনা সাঁওতালদের মনে কম-বেশি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়ার তাৎপর্য বুঝতে

হলে বোঞ্জআদের প্রকারভেদ ও তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে যেসব ধারণা ব্যক্তিদের মনে নিগূঢ়ভাবে কাজ করছে সে সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করা দরকার সে আলোচনা পাঠকদের খুবই নীরস লাগবে। তাই এবিষয়ে আলোচনা এইখানেই শেষ করছি।

গড়টেণ্ডীর পূজা শেষ হলে নায়েকে অর্থাৎ পুরোহিতের মূল কর্তব্য প্রায় শেষ হয়। এরপর সে একটা উনুন তৈরি করে সেখানে আতপ চাল ও বলিকৃত প্রথম দুটি মুরগির মাংস দিয়ে নিজের জন্য পাক শুরু করবে। ইত্যবসরে ওদিকে পাঁঠাবলিও (যদি সারা গ্রামের মানত্ করা হয়) শেষ হবে। এই বলি শেষে শুরু হবে বলিকৃত যাবতীয় (পাঁঠা, মুরগি, পায়রা) বস্তুগুলিকে আগুনে ঝল্সে নেওয়ার কাজ। দিকুদের মতো এরা ছাড়ায় না। পালক, লোম ইত্যাদি সব পুড়ে গেলে সেগুলিকে পরিষ্কার করে, টুকরো করে, সকালের সংগৃহীত চাল-ডালের ফুটন্ত খিচুড়ীর ডেক্ বা বড়ো হাঁড়ি বা কড়াইয়ের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। এইভাবে তৈরি হয় প্রসাদ। এই প্রসাদ ছোটো বড়ো, আপন-পর উপস্থিত সকল ব্যক্তিকেই দেওয়া হয়। মাঘ-সিমের প্রসাদ বিতরণের আগে আরো দু'একটি অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠান আছে যেগুলি আমাদের নির্বাচিত বিষয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেইগুলির কথা এখানে বলে রাখি। এদিকে যখন নায়েকে তার রসুই নিয়ে ব্যস্ত, ওদিকে অন্যান্যরা সকলের জন্য প্রসাদ প্রস্তুতকরণে নিযুক্ত, সেই ফাঁকে কুড়ুম-নায়েকের নেতৃত্বে গ্রাম-পঞ্চায়েতের বাকি সভ্যরা চলে যাবে গ্রামের ভিতর। সেখানে একটি পরিবারে, যাদের গোরুতে গত বাদ্না পরবে ডিম ভেঙেছিল বা খেয়েছিল, সেই পরিবারের কর্তা গ্রামপঞ্চায়েতের সভ্যদের জন্য বিশেষ যত্নসহকারে এক গোলা বা বড়ো কলসি মদ বা হাঁড়িয়া প্রস্তুত রেখেছে। মাঠ থেকে যখন এই সভ্যরা ঐ বাড়িতে আসবে তখন গৃহস্বামী ও পরিবারের উপস্থিত লোকেরা তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাবে এবং ঐ বিশেষভাবে রক্ষিত হাঁড়িয়ার উপরের তরল অংশ, যেটা বেশ কড়া এবং সুস্বাদু (?), থেকে খানিকটা একটি বাটিতে ঢেলে রেখে বাকিটা উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে নির্জলা পান করতে দেবে। সভ্যরা ঐ বস্তুটি পান করে পরিতৃপ্তি প্রকাশ করে গৃহস্বামীর পরের বারে ধান চাষে বিশেষ উন্নতি হোক এই আশা

প্রকাশ করে আবার সকলে মিলে মাঠে চলে যাবে। এদের সঙ্গে যাবে সর্বাগ্রে বাটিতে রাখা মদটুকু। এই মদ দিয়ে নায়েকে 'মারাং-বুরু'র পূজা করবে। এই পূজার মন্ত্রের ভাবার্থ হচ্ছে ঃ

"যাতে আমরা আগামী সারা বছর ভালো থাকি, বছরের শেষ দিনটাতে তাই তোমাকে দিলাম, তোমার কৃপায় ভালো থাকলে আবার আসছে বছর তোমায় দেব।"

মন্ত্র অনুযায়ী মাঘ-সিম্ পরব হবে বছরের শেষ দিনে, অর্থাৎ পরের দিন থেকে শুরু হবে ওদের নতুন বছর। কিন্তু সব সময়ে নিয়মের এই কড়াকড়ি মেনে চলা হয় না। তবে দু'একদিনের বেশি ফারাকও ওরা পছন্দ করে না।

ইত্যবসরে প্রসাদ বিতরণের কাজও অনেকটা এগিয়ে গেছে। ছোটো-ছোটো ছেলের দলকে খাওয়ানোর জন্য তাদেব পঙ্‌ক্তিবন্দী করা হচ্ছে। এদিকে পূর্ণবয়স্কদের মধ্যে বেশ চাপা উত্তেজনা। পঞ্চায়েতের মুরুব্বিরা গভীর স্বরে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনায় রত। খোঁজ নিলে জানা যাবে, গত বছরে যারা এই দিনটিতে গ্রাম-পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বিভাগে নির্বাচিত হয়ে সভ্য হবার অধিকাবী হয়েছিল আজ একবছব পরে তাদের কর্তব্যকর্মের বিচাব হচ্ছে। এই দলের নায়ক হচ্ছে কুড়ুম-নায়েকে। তার সমক্ষে গ্রামের যার যা বক্তব্য আছে তা জানাচ্ছে। সে সকলের বক্তব্য শুনে আলোচনান্তে রায় দিচ্ছে। এর ফলে কেউ বা প্রশংসা পাচ্ছে আবার কারো বা শাস্তির বিধান হচ্ছে। এখানে একটি শাস্তির ঘটনার উল্লেখ করছি—

এক ব্যক্তিকে তার অপরাধের জন্য পঙ্‌ক্তিতে বসে খিচুড়ি বা প্রসাদ খেতে দেওয়া হল না। পাতাসুদ্ধ প্রসাদ তুলে নিয়ে পঙ্‌ক্তি থেকে দূরে একা একা বসে তাকে খেতে হল। ঘাড় হেঁট করে সাশ্রুনয়নে তাকে সেদিন শাস্তি মেনে নিতে হয়েছে, পঞ্চায়েতের অপরিহার্য নির্দেশ।

কর্মীদের কাজের বিচার ছাড়া অন্যদের সম্বন্ধে কর্মীদের নালিশ, যেগুলি গুরুতর, তারও এখানে বিচার হয় এবং যথারীতি শাস্তিবিধানও হয়ে থাকে।

এইখানে সভার মাঝে কুড়ুম-নায়েকের নিকট বছরের আর্থিক হিসাব-

নিকাশও পেশ করতে হয় সংশ্লিষ্ট সভ্যকে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, শাস্তির মধ্যে আর্থিক জরিমানাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে করা হয়। সেই জরিমানার অর্থ এই সময়ে শোধ করতেই হবে।

এই বিচারসভা চলার সঙ্গে সঙ্গে পানীয় অর্থাৎ হাঁড়িয়া সমানে চলতে থাকে। বিচারসভা শেষে আরম্ভ হয় নির্বাচনী সভা। এই নির্বাচন পর্ব যেভাবে সমাধা হয় তা দেখে মনে হয়েছে, যেন দু-চার জন মাতব্বর ব্যক্তি আগে থেকে সভ্য অদল-বদলের বিষয় চিন্তা করেই রেখেছিল ; সেটাকে কেবল মিটিঙের মাধ্যমে সর্বজনগ্রাহ্য করে নেওয়া হল। তবে সব সময় এরূপ হয় না, তা তৎকালীন আলোচনা থেকেই বোঝা যায়। যাই হোক, এই নির্বাচনপর্ব শেষ হলেই মাতব্বরদের কোলে পাতা পড়তে শুরু করে, এবং পদমর্যাদা অনুসারে প্রসাদের ডালির কমবেশি হয়ে থাকে। আগেই বলেছি কুড়ুম-নায়েকে এই পদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। প্রসাদের পরিবেশনের সময়ও দেখা গেল তার সামনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পাতা (খিচুড়ি সমেত) জমেছে।

ইতিমধ্যে ওদিকের খাওয়া-দাওয়া প্রায় শেষ। ছেলেরা সব গ্রামে ফিরে গেছে। কয়েকজন উদ্যোগী কর্মী তখন জিনিসপত্র গোছ-গাছ করে নিতে ব্যস্ত। এই সময়ে নায়েকে ও কুড়ুম-নায়েকের নেতৃত্বে প্রশাসনিক দলটি গ্রামের দিকে রওনা হবে, বাকিরা অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রামে ফিরে যাবে। ততক্ষণে মাঠের মধ্যে দিনের আলো দ্রুত অপসৃয়মান এবং গ্রামের ভিতরে সন্ধ্যা জাঁকিয়ে বসে গেছে। পরিবারের উঠোনে-উঠোনে হ্যারিকেন বা কুপি জ্বলে উঠেছে।

সাধারণভাবে বলা চলে এইখানেই মাঘসিম্ পরবের শেষ। কিন্তু আসলে তা নয়। আরো কিছু বাকি আছে। এর মধ্যে অন্তত একটি অনুষ্ঠান সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই অনুষ্ঠানটির বিষয়ে কিছু বলার আগে এই সময়ে সারা গ্রাম জুড়ে যা ঘটছে সে সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে নিই।

এই সন্ধ্যার সময় এক বাড়ির লোক অন্য বাড়িতে যখন যাবে তাকে গৃহস্বামী বা গৃহকর্ত্রী মদ খাবার জন্য অনুরোধ করবে ; এবং মদের সঙ্গে কিছু পরিমান চাট্ বা চর্ব্যবস্তুও অনেক বাড়িতেই দেবে। অন্য কিছু, অর্থাৎ মাংসাদি না থাকলে নিদেনপক্ষে কিছু মুড়ি ও কলাইভাজা দেবে।

আজকাল দেখছি দু-এক বাড়িতে চানাচুর, ডালমুট দিয়েও কোনো কোনো অতিথিকে (দিকু) আপ্যায়ন করছে। উঠ্‌তি বয়সের ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে ছেলেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মদ আদায় করে খাওয়াটা খুব আমোদের সঙ্গে করে থাকে। সেই সঙ্গে মজা করে কথা বলা, পরস্পর ঠাট্টা-তামাসা খুব চলে। এরই ফাঁকে ফাঁকে হাসির লহরা এবং অঙ্গভঙ্গী যেভাবে চলতে থাকে তাতে বেশ কিছুটা আদিরসের প্রাধান্য যে আছে তাতে সন্দেহ নেই। এই পরস্পর কথা কাটাকাটি, অনেকটা তর্জার লড়াইয়ের মতো, সবই তাৎক্ষনিক ঘটনা-সংশ্লিষ্ট, আগে থাকতে ভাবনা চিন্তা করে যে কিছু করা হয় তা মনে হয় না। তবে এরূপ ব্যাপার ব্যক্তি-সম্পর্কের প্রতি যে যথেষ্ট নির্ভরশীল তা অনস্বীকার্য।

এই সময় নাচ, গান, বাজনা-বাদ্যিও কিছু কিছু হয়, তবে বাদ্‌না পরবের তুলনায় কিছুই নয়। নাচ গানেব ধরন দেখে মনে হয় এই সন্ধ্যায় ওটি মূল বিষয়ের মধ্যে যেন নেই। বাদ্‌না পরবের কয়েকটি গান এইদিনেও গাইতে শোনা যায়। এই পরবের জন্য বিশেষ করে কোনো গান আছে বলে শুনিনি। তবে হ্যাঁ, মাঠে পূজোর পরে কর্মী নির্বাচনের সময় যেসব গান কুড়ুম-নায়েকের নেতৃত্বে গাওয়া হয় তার বিষয়-বৈশিষ্ট্য আছে। মাঠে এই সময়ে যে সব গান গাওয়া হয় তার বিষয়বস্তুর মধ্যে বেশির ভাগই অশ্লীল ও ঠাট্টার বিষয়। যেগুলি স্ত্রীলোকদের পক্ষে শ্রোতব্য নয়। সেই জন্যই নাকি পরবে স্ত্রীলোক, এমন কি ছোটো মেয়েদের সান্নিধ্যও বাঞ্ছনীয় নয়।

এই সূত্রে কুড়ুম-নায়েকের নেতৃত্বে আর একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের উল্লেখ করে রাখছি।— কুড়ুম-নায়েকে প্রসাদ খেয়ে একটা শালপাতায় অল্প আতপ চাল নিয়ে সভাস্থল থেকে খানিকটা দূরে চলে গেল। তার পিছনে মাঝি বা সর্দার এক ঘটি জল নিয়ে চলল। সর্দারের পিছনে চলল আরো একজন। লক্ষণীয়, একই জায়গায় তিনজনে বসেছিল এবং একই জায়গায় পরে গেল, কিন্তু একসঙ্গে তিনজন গেল না। কুড়ুম-নায়েকে একা একটি 'আল'-এর আড়ালে বসে কি যেন করল। আবার একটু পরে গিয়ে এবারে তিনজনেই একসঙ্গে সেখানে অনেকক্ষণ ধরে কিছু ক্রিয়াকলাপ করতে থাকল। এর মধ্যে (যতটা দূর থেকে দেখা যায়) আতপ চাল মাটিতে দেওয়া, মন্ত্রাদি উচ্চারণ এবং কুড়ুম নায়েকে কর্তৃক

নিজ উরুতে থাপ্পড় মেরে কিছু বক্তব্য রাখা। এটা শেষ হলে সর্দার জলের ঘটি নিয়ে ফিরে এল। বাকি দুজন একসঙ্গে বসে ঐ জায়গায় প্রস্রাব করল। পরে আবার সভাস্থলে এসে বসল। এই তৃতীয় ব্যক্তিটি কুডুম-নায়েকের সাকরেদ।

এই আচারটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানবার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। উত্তর পেয়েছি : ওটা কারো দেখতে নেই। ওতে গুপ্ত মন্ত্র আছে। প্রকাশ ও প্রচার হলে সমাজের ক্ষতি হবে, ইত্যাদি। মোট কথা, আমার যা মনে হয়েছে তা হল, এই ব্যাপারটি দুষ্ট বোঙাদের নিয়ে, যাদের ক্রোধোদ্রেককে সাঁওতালরা খুব ভয় করে, তাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য সাঁওতাল সমাজ কুডুম-নায়েকের উপর নির্ভর করে। যেন এই কুডুম-নায়েকেই ক্রুদ্ধ বোঙাদের প্রতিকর্তা।

আর একটি অনুষ্ঠান বা আচারের কথা বলে এই প্রসঙ্গের শেষ করব। এখানে আর একবার বলে রাখি বাদ্না পরব যতবার পর্যবেক্ষণ করেছি, প্রত্যেক বারই কেন জানি না সমস্ত পরিবেশটা মনে করিয়ে দিয়েছে এই পরবের সঙ্গে কোথায় যেন হিন্দুদের গোষ্ঠলীলা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিল আছে। হিন্দুদের ধর্মাচার সম্বন্ধেও আমার জ্ঞান তথৈবচ। তাই সোজাসুজি কোনো প্রমাণ আমার পর্যবেক্ষণের মধ্যে যখন পাইনি তখন ও নিয়ে আর মাথা ঘামাইনি। কিন্তু পরবর্তী কালে একগ্রামের মাঘ-সিম পরব পর্যবেক্ষণ কালে একটি আপাত-অপ্রধান অনুষ্ঠানের মধ্যে দৈবাৎই বলা যায়, এমন একটি গান কানে এল যা শুনে আমার মনের প্রায় ভুলে যাওয়া প্রশ্নটা জেগে উঠল। এই ঘটনাটাই এখন বলব ;

ঐ যে মাঠ থেকে যখন সকলে বাড়ি ফিরল, কর্মচারীরা যে যার বাড়ি ঢুকল, সেদিন আমি নায়েকের আমন্ত্রণে তার সঙ্গে তার বাড়ি গেলাম। দেখলাম নায়েকের স্ত্রী এর জন্য প্রস্তুতই ছিল। নায়েকে তার ঘরের দাওয়ায় ওঠার আগে তার স্ত্রী একটি কাঁসার থালায় নায়েকের বাঁ পা রেখে জামবাটি থেকে জল নিয়ে পাখানি ধুইয়ে মুছিয়ে তাতে তেল (সরিষার) মাখিয়ে দিল। এইভাবে ডান পাটিও ধুইয়ে মুছিয়ে তেল মাখিয়ে দিল। এর পর নায়েকে নিজের ঘরে ঢুকল। ইত্যবসরে আরো কিছু লোক উঠোনে জমা হয়েছে। তাদের সকলকে মদ দিয়ে আপ্যায়ন করা হচ্ছে। সকলেই নেশায় মৌজ, কিন্তু কেউ কোনো

অসভ্যতা বা গোলমাল করছে না। এর পর কতকগুলি ছোকরা বয়সের ছেলে এল, তাদেরও শাল পাতার ঠোঙা করে মদ দেওয়া হল। আর একটি ছেলের দল, বয়স ১৬-১৭ বছর হবে, পোষাক-আসাক বেশ পরিচ্ছন্ন লাগল, উঠানে ঢুকে সোজা নায়েকের ঘরটির সামনে দাঁড়াল। উপস্থিত সকলে এদের জন্য অপেক্ষা করছিল এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। এই ছেলেদের কারো কারো হাতে বাঁশি (মুরলি), অন্যদের হাতে একটি করে লম্বা কঞ্চি, ঐ কঞ্চির মাথায় কিছুটা খড় বাঁধা, অনেকটা মশালেব আকার; এই কঞ্চিগুলি দিয়ে তারা নায়েকের ঘবের খড়ের চালের উপর খড়গুলি ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে ঘোরাতে থাকল। মুখে গান এবং বাঁশিতে সুর বেজে চলল। একই গান ও সুর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চলছে। পরিবেশটা বেশ ভাবগম্ভীর হয়ে উঠল। ওদিকে গৃহস্বামী ও তার স্ত্রী বারান্দায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে তাদের আগমনকে যেন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। এই গানটির কথাই আমি আগে উল্লেখ করছি। এটির বাংলায় অর্থ হল—

তোমার ঘরে জল পড়ছিল, আজ আমরা তোমার ঘর ছেয়ে দিলাম। আর জল পড়বে না।

এর পর ঐ ছেলের দলকে এক ধারে বসানো হল এবং তাদের মদ দিয়ে আপ্যায়ন করা হল।

এই দলের একটি ছেলেকে প্রশ্ন করাতে সে দেখিয়ে দিল অন্য একটি ছেলেকে, যে হল তাদের দলের নেতা; তাদের কৃষ্ণ। অন্য একজনকে দেখিয়ে বলল, সে বলরাম কৃষ্ণের সতাসং। অন্যরা তাদের সঙ্গী! তারা আসছে গোষ্ঠ থেকে, মানে বৃন্দাবনের গোষ্ঠ থেকে!

এর বেশি ঐ ছেলেরা জানে না।

এই অনুষঙ্গ কি ভাবে এল? সমাজ-বিজ্ঞানীরা হয়তো বলতে পারবেন। তাঁদের বিবেচনার জন্য আমি এখানে ছেড়ে দিলাম।

এই প্রসঙ্গে ১৯৫৪ সালের এই গ্রামেরই একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। ঘটনাটি ঘটেছিল এই নায়েকেরই উঠানে। বলা যায় তখন সাঁওতালদের সঙ্গে পরিচয়ের আমার 'হাতে-খড়ি'র পর্যায়ে চলছে। গ্রামের বেশ কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে পরিচয় করতে অগ্রসর হয়েছিলাম সে কাজ

আমার হয়ে গেছে, তবু আমার আস্তানাটা কাছাকাছি ছিল বলে অবসর সময়ে যাই ওদের মাঝে। এমনি একদিন দুপুর বেলা, তখন গৃহস্বামীর খড়ের ঘরে নতুন ছাউনি দেওয়ার কাজ চলছে। আমাকে বলল : বাবু আজ বিকালে একবার গরিবের বাড়ি আসবেন। রাজি হলাম বটে, কিন্তু কৌতূহল হল, ব্যাপারটি কি ? আচ্ছা দেখাই যাক্ না।

গেলাম সেদিন। তখনো বেশ বেলা আছে। দেখি বাড়ির পরিষ্কার উঠোনে বেশ কয়েকজন—পাঁচ-ছ'জন হবে, উপস্থিত। সকলেই সাঁওতাল। তারা গল্প করছে। মেঝেনদের মধ্যে মাত্র একজন। গৃহকর্ত্রী স্বয়ং! সকলেরই মুখ চেনা ; কারো কারো নামও মনে ছিল। তখন সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলাম : ব্যাপার কি ? ওরা বোধহয় আমার বোকামিটা বুঝতে পেরেছিল। তাই আমাকে আসল কথাটা না বলে একটু খেলাচ্ছিল। একটু ঠাট্টা তামাসা করছিল। ইতিমধ্যে মুড়ি, চালভাজা ও কলাইভাজা প্রচুর জমা হল। গৃহকর্ত্রী, যুবতী মেঝেন সাঁওতালি ভাষায় মাঝিদের যেন একটু শাসন করল মনে হল। আমার প্রতি মাঝিরা সদয় হয়ে উঠল। গৃহকর্ত্রী একটি ঝক্ঝকে কাঁসার বাটিতে চালভাজা ভর্তি করে আমার সামনে ধরল। আমি গ্রামছাড়া লোক এবং নিমন্ত্রিত তাই সর্বাগ্রে আমাকে দিল। পরে পরে সকলকে যে যার গামছায় প্রচুর পরিমাণে মুড়ি ও ছোলা কলাই ভাজা পরিবেশন করল। ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর থেকে একটি বড়ো কলসি এল— একগোলা হাঁড়িয়া। এই গ্রামে তখনো হাঁড়িয়ার সঙ্গে আমার প্রাথমিক পরিচয় হয় নি।

যাই হোক, সংক্ষেপে বলি। তখনো ওদের মধ্যে এই ব্যবস্থা ছিল যে, গ্রামের কারো ঘর ছাইতে হলে ঘরামীর জন্য গৃহস্বামীকে কোনো মজুরি দিতে হত না। সরঞ্জামাদি জোগাড় করে গ্রামের মাতব্বরদের জানিয়ে দিলেই একদিন ঘর ছাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়ে যেত। কাজ শেষ হলে গৃহস্বামী ঐ ঘরামীর দলকে হাঁড়িয়া ইত্যাদি খাইয়ে সন্তুষ্ট করত। এই সঙ্গে গ্রামের মুরব্বিরাও কেউ কেউ অনেক সময় থাকত। মোদ্দা কথা তখন এই ব্যাপারটার একটা সামাজিক রূপ ছিল ; আজকের মতো শুধু অন্যতম অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল না।

গ্রামপঞ্চায়েতের সভ্যদের মধ্যে যদি কারো ঘর ছাওয়ার সরঞ্জামের অভাব হত এবং অন্য কারো ঐ দ্রব্যের প্রাচুর্য থাকত তাহলে অভাবী

ব্যক্তিকে ভাবতে হত না। গ্রামের মধ্যে নায়েকের ছিল একটি বিশেষ সম্মান। তার সুখ-সুবিধা দেখা অন্যদের কর্তব্যের মধ্যে ছিল। এটা বেশি দিনের কথা নয়, মাত্র বিশ বছর আগেকার কথা।[১] এরি মধ্যে[২] ঐ গ্রামে সামাজিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এসে গেছে, তাকে এক কথায় বলা যায়, গ্রামীন শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। পার্বণের মধ্যে যে সাংগঠনিক মূল্য ছিল সেগুলো যেন নিয়ম রক্ষা করার দায়ে পরিণত হচ্ছে। যেমন ঐ কৃষ্ণ-বলরামের দলের ঘর ছাওয়া একটি প্রতীক বা আচারে দাঁড়িয়ে গেছে। নায়েকের ফুটো চালে জল পড়লেও তা বন্ধ করার সত্যিকারের কোনো চেষ্টা আজ আর হয় না। তেমনি অনেক ব্যাপারে পরবের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক আস্তে আস্তে ক্ষীণ হতে চলেছে। জানি না এটি সংস্কৃতির প্রগতির না অধোগতির পরিচয়। সংস্কৃতির সঙ্গে মানব-জীবনের যদি সক্রিয় সহযোগিতার যোগ না থাকে তাহলে একে অপর থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য। তাই মনে হয় এ যেন বর্তমান যুগে অবশ্যম্ভাবী। সাঁওতাল সমাজই বা এর হাত থেকে রেহাই পাবে কি করে?

১ ঘটনাকাল ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ।

২ ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।

চতুর্থ অধ্যায়

বাহা পরব

সাঁওতালি ভাষায় বাহার অর্থ ফুল। সেই অর্থে বাহা পরবকে ফুলের উৎসব বা পুষ্পোৎসব বলা উচিত। কিন্তু বাহাকে এই অর্থে না বুঝে এর প্রচলিত স্থানীয় অর্থে বলা হয় দোল।

একাধিক সাঁওতালকে জিজ্ঞাসা করেছি: আচ্ছা উৎসবটা তোমাদের কি রকম উৎসব? কি উদ্দেশ্যে তোমারা এই পরবটা কর? যারা উত্তর দিয়েছে তারা প্রত্যেকেই বলেছে: বুঝলেন না, আপনারা যেমন 'দোল' করেন, আমাদের এই পরবটা হল সেই দোল। তবে…

এই তবে-র পরে তারা যা যা বলে, অর্থাৎ হিন্দুদের দোল থেকে তাদের বাহার যে যে বিষয়ে তফাৎ, তার বিস্তারিত বিচার করতে গেলে দেখা যাবে সাঁওতালি বাহা হিন্দুদের দোলের কাছাকাছি গেলেও দুটো উৎসব এক নয়। সে যাই হোক এর চুলচেরা বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমার এখানে উদ্দেশ্য হ'ল সাঁওতালি বাহা উৎসব সত্যি করে কিভাবে অনুষ্ঠিত হয় তারই একটি যথাযথ বিবরণ দেওয়া; যাতে আগ্রহী পাঠক নিজেই বিচার করে দেখার সুযোগ পান যে, এই উৎসবের সঙ্গে হিন্দুদের দোলোৎসবের বা অন্য কোনো দেশের অনুরূপ উৎসবের সম্পর্ক কিরূপ। এই সঙ্গে সাঁওতাল সমাজের বর্তমান প্রশাসনের যোগসূত্র কতটা সেটিরও কতকটা আভাস দেওয়া।

প্রকাশের এবং বোঝার সুবিধার্থে আমি একটি গ্রামের অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করেই শুরু করছি।

সেদিনের[১] কালীগঞ্জের অনুষ্ঠান হল ওদের 'জেহেরস্থানে'— বনবিভাগের এলাকার মধ্যে; অর্থাৎ যেখানে নিয়ম-মাফিক সাঁওতালদের অবাধ প্রবেশাধিকার নেই। ওরা নিয়মভঙ্গ করেই ঐখানে আজকাল পরব করতে যায়, এবং বনবিভাগের লোকেরা একথা জেনেও কোনো আপত্তি করেন না। তিন চার বছর আগে যখন বনবিভাগ আপত্তি করেছিল, সেটা কার্তিকমাসে কালীপূজার সময়, তখন এরাও জোর

করেছিল গেটের চাবি দিতেই হবে, নইলে আমরা বেড়া ভেঙে ঢুকব, আমাদের পূজোর থানে (জেহেরস্থানে) কালীপূজো করব। শেষ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সুবুদ্ধির উদয় হয়, ওদের জন্য গেটের চাবি খুলে দিলে ওরা জেহেরস্থানে দলবল নিয়ে কালীপূজো করে আসে। সেই থেকে বছরে তিনটি পরব ওরা জেহেরস্থানেই করে আসছে। এই পরবগুলি হল : এরক্ সিম, কালীপূজো ও বাহ্য। আরো যে দুটি বড়ো পরব, যথা— বাদ্‌না ও মাঘ সিম্, ওরা করে ফাঁকা মাঠে— ধানক্ষেতে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি পাশের গ্রাম পিয়ার্সন পল্লীর জেহেরস্থান কালীগঞ্জের জেহেরস্থানের মাত্র দুশো হাত দূরে ছিল, ঐ বছর বনবিভাগের মতি-গতি দেখে পিয়ার্সনপল্লীতে হাঙ্গামা ও অত্যাচারের ভয়ে বনের ভিতরের পুরোনো জেহেরস্থানের মায়া ত্যাগ করে ওদের গ্রামের দক্ষিণদিকে নিজেদের চাষের জমির একপাশে নতুন জেহেরস্থান স্থাপন করে নেয়। এটা ঘটে ১৯৬১ সালে। সেই থেকেই পিয়ার্সন পল্লী তাদের বাহ্য পরব নতুন জেহেরস্থানেই করে আসছে।

জেহেরস্থান সাধারণত চার পাঁচটি গাছের একটি কুঞ্জবন। এই কুঞ্জের মধ্যে শাল গাছ ও 'নেউড়ী' (ওদের ভাষায়) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঐ সঙ্গে নিম বেল ইত্যাদি গাছও থাকে। কালীগঞ্জের বর্তমান জেহেরস্থানে একমাত্র নেউড়ী গাছ ছাড়া আর কিছু নেই। জেহেরস্থানে এরূপ দুরবস্থা কেন— জিজ্ঞাসা করাতে ওরা দুঃখ করে বলল, "কেবল পূজায় এখানে আসার আমাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কাজেই এর দেখাশুনা হয় না ; অন্য গাছগুলো মরে গেলেও আমাদের করার কিছু নেই। হয়তো এতো শক্ত গাছ নেউড়ী গাছটাও একদিন মরে যাবে।" বললাম, "তবে তোমরা আর একটা 'জেহেরস্থান' এখন থেকে করে নাও না কেন ? একটা নেউড়ী গাছও···", আমায় শেষ করতে সময় না দিয়ে কুড়ুম-নায়েকে বলে উঠল,— "নেউড়ী গাছ কোথায় পাব ? যেখানে সেখানে তো এ গাছ পাওয়া যায় না। তাছাড়া ভাবুন বাপঠাকুর্দারা এখানেই পূজো করেছে কত বছর ধরে, আমরা পূর্বপুরুষদের সেই পূজোর জায়গা ছেড়ে যাই কি করে ?" সমবেত গ্রামবাসীদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম তাদের সকলের চোখে মুখে সহৃদয় সম্মতি ফুটে উঠছে। অতএব এ ব্যাপারে অনেক যুক্তি-তর্ক করার থাকলেও এই পরিস্থিতিতে তা মোটেই

সমীচীন হবে না বুঝে ওদের বিশ্বাসকেই শিরোধার্য করে নিলাম। প্রশ্নোত্তরটা জেহেরস্থানের পাশে বসেই হচ্ছিল।

এখন 'বাহা' পরবের প্রস্তুতি-পর্বে আসা যাক।

বাদ্‌না বা মাঘ-সিম পরবের প্রস্তুতি পর্বে গোডেৎ-এর নেতৃত্বে গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে যেভাবে দ্রব্যাদি সংগ্রহের কথা বলেছি তার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যেখানে নিছক পুনরুল্লেখ মাত্র সেগুলির আর উল্লেখ না করে বরং যেখানে নতুন কিছু বক্তব্য আছে সেইগুলিই আজ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করব। অবশ্য 'বাহা' পরবটি যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বোধগম্য হয় সেদিকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য থাকবে। জেহেরস্থানে গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সভ্যরা উপস্থিত থাকবে এটাই নিয়ম। কিন্তু মাঘ-সিম বা বাদ্‌না পরবের মতো এই বাহা পরবে উপস্থিতির সংখ্যা কম হয়। কারণ হিসাবে যা জানা যায় তা হল এই পরবটায় কষ্ট আছে। তার প্রধান কারণ গরম,— চৈত্র মাসের গরম, রোদের জোর খুব। আগেই বলা হয়েছে জেহেরস্থানের দেখাশুনা করা হয় না বলে গাছপালা মরে গেছে। কুঞ্জবনের ছায়া নামমাত্র। কাছাকাছিও গাছের ছায়া তেমন নেই যেখানে বসে কাজের ফাঁকে লোকে বিশ্রাম করতে পারবে। একটু দূরে বনবিভাগের নতুন শালের সারি উঠছে বটে কিন্তু তার ছায়াও এমন পর্যাপ্ত নয়। সেইখানেই অবশ্য আজ প্রসাদ তৈরি হচ্ছে। অগত্যা ঐ যৎকিঞ্চিৎ ছায়ার তলাতেই ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ, যুবক সবাই এদিক ওদিক ছিটিয়ে রয়েছে।[১] দ্বিতীয় কারণ হিসাবে ওরা যা বলল, এই পূজোটা শেষ হতে অনেক সময় লাগে, প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা। ঠায় রোদের মধ্যেই থাকতে হয়, বড়ো কষ্টকর। তাই বয়স্ক লেকেরা (পঞ্চায়েতের সভ্য হলেও) আসে না। একথা সত্যি বলেই মনে হল। এবছরও এখানে পঞ্চাশোত্তীর্ণ ব্যক্তি মাত্র দুজন, যেখানে সমবেত লোকসংখ্যা ছিল তিপান্ন। প্রসাদ বিতরণের সময় আরো ছ'সাত জন ছেলেমেয়ে এসে হাজির হয়েছিল।[২]

---

১ আমি অন্য গ্রামে দেখেছি, যেখানে জেহেরস্থানের সন্নিকটে গাছের ছায়া বর্তমান, এমন কি জেহেরস্থান থেকে গ্রামের দূরত্ব একশো গজের বেশি হবে না সেখানেও উপস্থিতির সংখ্যা বাহা পরবে বেশ কম।

২ গ্রামটির মোট জনসংখ্যা দেড়শ'র কাছাকাছি।

আরো একটি কারণ আছে— বলতে গিয়ে হাসতে হাসতে সেদিন ঐ গ্রামের কুড়ুম-নায়েকে থেমে গেল। তার হাসিটি তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছিল। একটু উস্‌কে দিতে জানা গেল যে, অন্যান্য পরবগুলির মতো বিশেষ করে বাদ্‌না, মাঘ-সিম বা কালীপূজোর কথা বলা যায়; "বাহা" পরবে মদ বা হাঁড়িয়ার আকর্ষণ একেবারেই নেই। পূজাস্থানে তো হাঁড়িয়ার প্রবেশ নিষেধই। 'বাহা' পরবের প্রস্তুতি, পূজা এবং প্রসাদ বিতরণ ও গ্রামের মধ্যে ফিরে এসে যেসব অনুষ্ঠানাদি হয় সব কিছু শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাঁড়িয়া বা পচুই মদের প্রবেশ নেই; তবে সব অনুষ্ঠান ক্রিয়া-কলাপ শেষ হয়ে গেলে বাড়ি বাড়ি লোক গেলে গৃহস্বামী আগন্তুককে দু-এক বাটি হাঁড়িয়া দিয়ে আপ্যায়ন করতে পারে, করেও থাকে।[১]

এখন আসা যাক পূজার ব্যাপারটায়। আগে আমি উল্লেখ করেছি (বাদ্‌না ও মাঘ-সিম দ্রষ্টব্য) যে পূজানুষ্ঠানে নায়েকেই হচ্ছে প্রধান। সে পুরোহিত। কুড়ুম-নায়েকে তার নিকটতম সহকারী। এখানেও মূলত তাই-ই। তবে খুঁটিয়ে দেখলে অন্য ক্ষেত্র থেকে এই ক্ষেত্রে কুড়ুম-নায়েকের কৃতকর্মের মধ্যে বেশ কিছুটা তফাৎ আছে। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তফাৎ আমার যা মনে হল তা হচ্ছে নায়েকে গড়টেণ্ডি এলাকার পূজার ব্যাপারে নায়ক হলেও এই বাহা পরবে গড়টেণ্ডির বাইরে যে তিনটি ক্ষেত্রে পূজার ব্যবস্থা হয়, মুরগি বলি সমেত ঐ তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে দুটিতে পূজার অধিকারী হচ্ছে কুড়ুম-নায়েকে। অন্যটি নায়েকে। গড়টেণ্ডিতে মোট আঠারোটি[২], একক বা দলবদ্ধ দেব-দেবী বা বোঙাদের বা অন্য সব কিছুর পূজা হয় নায়েকের নেতৃত্বে—কুড়ুম-নায়েকের সাহচর্যে। গড়টেণ্ডির বাইরে দুটি ক্ষেত্রের পূজার নেতৃত্ব নেয় কুড়ুম-নায়েকে এবং তাকে সাহায্য করে পারানিক। এর বিশেষ তাৎপর্য আছে বলেই আমার মনে হয়েছে, কিন্তু কি সেই তাৎপর্য তা আজও সঠিকভাবে পাই নি। কোনো দুষ্ট বোঙাআর সন্তুষ্টির ব্যাপার বললে অতি সাধারণ উত্তর হয়। সেটা তো সব পুজোতেই রয়েছে। গড়টেণ্ডির অন্তর্ভুক্ত পূজার মধ্যে

১ এর ব্যতিক্রম আমি একটি গ্রামে এখন থেকে বিশ বছর আগে দেখেছিলাম, একই অঞ্চলে যেখানে পরব চলাকালীন গৃহস্বামী দিকু অতিথিদের হাঁড়িয়া প্রসাদ হিসাবে দিয়ে আপ্যায়ন করেছে।

২ এই সংখ্যা স্থানবিশেষে কম বেশি হতে পারে।

এটাই তো প্রধান। সংশ্লিষ্ট সভারা এসব ব্যাপারে সহজে মুখ খোলে না। পাছে বোঞআর রোষের উদয় হয়, তার বা তাদের ক্ষতি হয়, তাই এই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজ নয়। যাই হোক, এই তিনটি গডটেণ্ডি-বহির্ভূত অনুষ্ঠানকে বাদ দিয়ে গডটেণ্ডির অন্তর্ভুক্ত আঠারোটি বিভিন্ন পূজ্যদের সম্বন্ধে আগে যে খবর দিতে পারিনি, এবারে সেদিন এক অভাবনীয় সুযোগ ঘটে গেল এবং আমিও সেই সুযোগে গূঢ় তথ্য কিছু সংগ্রহ করে নিলাম। সেগুলি পাঠকের অবগতার্থে এখানে নিবেদন করছি—

গডটেণ্ডিতে যে আঠারোটি চৌখুপী করা হয় সেইগুলির এক একটি বোঞআ বা সংযুক্তভাবে কয়েকটি বোঞআর আস্তানা হিসাবে কল্পনা করে নিয়ে সেই সেই অশরীরীদের উদ্দেশে পূজার উপকরণ উৎসর্গ করা হয়। সেই আঠারোটির নাম ক্রমিক সংখ্যানুসারে নিম্নে লিখিত হ'ল।[১]

১. ঘরের অধিষ্ঠাত্রী জাহের বোঞআ
২. মঁড়েকো বোঞআ
৩. তুরুকু বোঞআ
৪. গোঁসাই এরা বোঞআ
৫. পরগণা বোঞআ
৬. জাহের সীমে সাড়ী বোঞআ
৭. মাঝি হাড়াম
৮. ছোটো মাঝি হাড়াম
৯. মারাং বুরু
১০. জটা মাঠ বোঞআ
১১. শুনুড়ু্র বোঞআ
১২. মারাং বাড়ি বোঞআ
১৩. কালীগঞ্জ মারাং খেজুর বোঞআ
১৪. কালী সায়রের মা কালী
১৫. ভাটিশাল বোঞআ

১ কালীগঞ্জ গ্রামের গোড়েৎ শ্রীশঙ্কর কিসকুর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

২ আমি এ সম্বন্ধে এযাবৎ যতটুকু জেনেছি তাতে মনে হয়েছে গ্রামভেদে এই ক্রমিক পরম্পরার কিছু ব্যতিক্রম হয়ে থাকে।

১৬. গাড়মুড় বোঞআ (চিপকুঠির দেবতা)

১৭. জামাদারি টেণ্ডিরেন বোঞআ (ডাঙার দেবতা)

১৮. চৌহদ্দির বোঞআ

আমি বুঝতে পারছি শুধু বোঞআদের নামগুলো জেনে অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ সন্তুষ্ট হতে পারবেন না। তবে এই প্রবন্ধের গণ্ডী পেরিয়ে বোঞআ রাজত্বে প্রবেশ করা এখন সম্ভব নয়, তার জন্য আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি অপরিহার্য। তাই এখানে একটুমাত্র বলে রাখতে চাই যে, গড়টেণ্ডির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি বোঞআর একটা না একটা ছোটো বড়ো ইতিহাস আছে। এই ইতিহাস কোনো কোনো ক্ষেত্রে পৌরাণিক, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোকাচার-বিদ্যা সংক্রান্ত। আবার এমনও কিছু আছে যেগুলি তুলনায় নেহাতই হাল আমলের।

আগে যে দুটি পরবের উল্লেখ করেছি সেখানে যে যে ভাবে এইসব বোঞআদের পূজা করা হয়েছে এই বাহা পরবেও সেইরূপ ভাবেই পূজা করা হয়। এইসব বোঞআদের পূজার উপকরণের মধ্যে মোরগ ও মুরগি বলি অপরিহার্য। এই বলির মধ্যেও আবার কিছু কিছু তারতম্য দৃষ্ট হয়। যেমন পরগনা বোঞআর বেলায় সাঁড়া অর্থাৎ মোরগ বলি চলবে না, এই বোঞআকে কালো রঙের মুরগি দিতে হবে। তেমনি গোঁসাই-এরা বোঞআর বেলায় লাল রঙের মুরগি চাই, অন্য রং চলবে না। আবার মারাংবুরুর ক্ষেত্রে সাদা মুরগি চাই-ই চাই।

বাহা পরবে অন্যান্য উপকরণের মধ্যে সব বোঞআর ক্ষেত্রে শালফুল একটি বিশেষ উপকরণ। 'বাহা' ছাড়া অন্য উৎসবে শালফুল ব্যবহার হয় না। অন্যান্য উপকরণের যেমন সিঁদুর, আতপ চাল ইত্যাদির ব্যবহার এই পুজোতেও একই ভাবে হয়ে থাকে।

আগেই উল্লেখ করেছি যে এই 'বাহা' পুজোতে অন্যান্য পরব থেকে কুড়ুম-নায়েকের প্রাধান্য কিছু বেশি। যেমন সে এককভাবে (পারানিকের সাহচর্যে) গড়টেণ্ডি বহির্ভূত দুটি বোঞআর পুজো করে থাকে এবং এই দুই জায়গার বলিদানের মুরগি সে নিজেই রসুই করবে। তেমনি আবার নায়েকেও এই পুজোতে গড়টেণ্ডির আঠারো রকমের বোঞআ ছাড়া আরো একটি বোঞআকে যথারীতি পূজা করবে। পূজা শেষে নায়েকে তার ভাগের মুরগিগুলি অন্য উপকরণের সঙ্গে রসুই করবে এবং

সেই খাদ্য খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করবে। তার কাজ শেষ হলে একই অগ্নিকুণ্ডে নতুন কাঠ দিয়ে রসুই শুরু করবে কুড়ুম-নায়েকে। সে ও তার স্ত্রী আগের দিন থেকে উপবাসী আছে। এইখানেই পূজার উপকরণ দিয়ে যে খাদ্য তৈরি হবে তাই খেয়ে কুড়ুম-নায়েকে তার উপবাস ভঙ্গ করবে। এদের উপবাসভঙ্গের খবর গ্রামে পৌঁছে গেলে তখন তাদের স্ত্রীবা বাড়িতে তাদের উপবাস ভঙ্গ করবে। লক্ষণীয় যে বাদ্‌না বা মাঘ-সিম পরবে কুড়ুম-নায়েকে 'গডটেণ্ডি'তে তার খাদ্য বসুই করে না বা ঐখানে বসে উপবাস ভঙ্গ করে না।

এই যে গডটেণ্ডি বহির্ভূত তিনটি স্থানে নায়েকে এবং কুড়ুম-নায়েকে পূজা কবল সে সম্বন্ধে জানতে চাইলে ও দুজনের মধ্যে কেউই সঠিক খবব দিতে চাইল না। কেবল বলল, ওটা অমনি পুজো, বাহাতে করতে হয়। কিন্তু কেন এ তিনটি গডটেণ্ডির বাইরে এবং ওরা কোন্ কোন্ বোঞআ— ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তব না পেলে উপস্থিত পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয়। একাধিক পরিস্থিতিতে চেষ্টা করেছি জানবার জন্য, কিন্তু একজন ছাড়া আব কেউ উত্তর দিতে রাজি হয় নি। যে একজন স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছিল সে-ও তার উত্তরটা অসমাপ্ত রেখে উঠে গিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, কোনো প্রাপ্তির লোভ দেখিয়ে কেউ কেউ ওদের কাছ থেকে কথা পেয়েছেন বলে শুনেছি ; কিন্তু ওদের সম্বন্ধে আমাব যতটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে জেনেছি যে, প্রাপ্তির সুযোগের সন্ধান পেলে ওদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষ করে যুবকরা, মন যোগানো কথা বলে বিজ্ঞানীকে ঠকায়। তা ছাডাও, অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলা ছাডাও ভুল খবর দেবার মতো মানসিকতাও এই অর্থপ্রাপ্তিব আশা থেকে সৃষ্টি হয়।

এখানে আর একবার উল্লেখ করছি যে, সকালে পূজার উপকরণ বিভিন্ন বাড়ি থেকে সংগ্রহ করাটা হল পরবের প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্ব হল পূজানুষ্ঠান। তৃতীয় পর্ব হল প্রসাদ বিতরণ ও ভোজন। এই পরবে মদ বা হাঁড়িয়া বর্জনীয়, আগেই বলেছি। এই উৎসবে এটাই হল একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চতুর্থ পর্বটির কথা এবার বলছি।

সাঁওতালদের দোল বলতে দিকুরা সাধারণত এই চতুর্থ পর্বকেই বোঝে। তার প্রধান কারণ এই পর্ব বা অঙ্কটি গ্রামের মধ্যে অনুষ্ঠিত

হয় এবং গ্রামের অনেকেই এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। একটু চেষ্টায় থাকলে এই ঘটনা সকলেই দেখার সুযোগ করে নিতে পারেন। এই পর্বকে বলা যেতে পারে বাহার শেষ অনুষ্ঠান। এর শুরু হয় জেহেরস্থান থেকে পূজাদি সমাপনান্তে পূজানুষ্ঠানে যে সব সভ্যরা সরাসরি যুক্ত ছিল প্রায় সর্বক্ষণ, তাদের দলটি গ্রামে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে। যাকে বলে 'ধূলো-পায়ে', এই দলটি 'কুলি'তে ঢুকেই প্রথম বাড়িটির দরজায় বা আঙিনায় এসে দাঁড়াবে। ছোট্ট একটি দলে চার-পাঁচ জনের বেশি লোক থাকবে না! সঙ্গের আর সব লোক যে যার বাড়ি চলে যাবে। ছোট্ট দলটির প্রধান হল নায়েকে বা পুরোহিত, তার সঙ্গে তারই নির্বাচিত জনৈক নব যুবক, তৃতীয় ব্যক্তি হল যে 'টামাক' বা নাকাড়া বাজাবে সে। ঐ নবযুবকের কাঁধে থাকবে একটি জলপূর্ণ মাটির কলস। এই তিন ব্যক্তি ছাড়া আরো দু'একজন মুরলী বাঁশি বাজনদারও থাকে। প্রথমোক্ত তিন ব্যক্তিই প্রধান, বাকিরা গৌণ।

এই দলটি গৃহস্থের আঙিনায় সশব্দে পৌঁছলেই সেই গৃহকর্ত্রী বা কর্ত্রীস্থানীয়া একজন হাতে জলের পাত্র এবং কিছুটা সরিষার তৈল নিয়ে হাজির হবে। সে প্রথমে নায়েকের একটি একটি করে দুটি পা ধুইয়ে দেবে। তার দুটি পায়ে পরিপাটি করে তেল মাখিয়ে দেবে। সবশেষে নায়েকে বয়সে বড়ো হলে 'ডব্' করবে; ছোটো বা সমপর্যায়ের হলে 'জোহার' করবে এবং অতি গুরুজন হলে প্রণাম করবে।

এইভাবে মুখ্য ব্যক্তিদের সকলকে গৃহকর্ত্রী অভ্যর্থনা জানাবে এক এক করে। নায়েকে একটি কুলোয় ভরে শালফুল সঙ্গে নিয়ে এসেছে জেহেরস্থান থেকে। সকলকে অভ্যর্থনা জানানো হলে নায়েকের ঐ ফুলভর্তি কুলোয় একপাত্র জল ঢেলে দেবে গৃহকর্ত্রী এবং নায়েকে গৃহকর্ত্রীর আঁচলে খানিকটা ফুল ভরে দেবে। ফুলগুলি সন্তর্পণে আঁচলে ধারণ করে গৃহকর্ত্রী আবার নায়েকেকে অভিবাদন জানাবে। এইখানেই এই বাড়ির কাজ শেষ হবে। এরপর কিছুক্ষণের জন্য নাকাড়ার বাজনা বন্ধ হবে, এবং দলটি অন্য একটি গৃহস্থের আঙিনার সন্নিকটবর্তী হলেই আবার নাকাড়া বেজে উঠবে এবং ঐ গৃহকর্ত্রী তখন বেরিয়ে আসবে হাতে তেল ও জলের পাত্র নিয়ে। এইভাবে গ্রামের 'কুলি'র দুইপাশে যে-সব গৃহস্থবাড়ি আছে, প্রত্যেকটি বাড়িতেই একের পর এক করে এই দলটি ঘুরবে।

যতক্ষণ না এই দলটি অনুষ্ঠান সেরে গৃহস্থের বাড়ির এলাকা পার হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ সেই বাড়ির ছেলেমেয়েরা পরস্পরের প্রতি জল ছোঁড়াছুঁড়ি করবে না। এদের দোল খেলা মানে এই জল খেলা আর মেয়েদের শালফুল দিয়ে সাজা। মনে রাখতে হবে এদের 'বাহা'তে রঙের কোনো কারবার নেই। এমনকি পূজোতেও রঙিন ফুলের ব্যবহার নেই। রঙ বলতে সিঁদুর ও মোরগ বা মুরগির লাল রক্ত। এই দুটি বস্তু এদের সব পূজোতেই থাকবে।

যখন গ্রামের সব বাড়ি ঘোরা হয়ে যাবে তখন পাড়ার ছেলেমেয়ে ছোটো-বড়ো সকলেই জল খেলায় কিছুক্ষণের জন্য মেতে যায়। সেই সময়ে পরিচিত 'দিকু' কেউ গ্রামে গেলে তারও রেহাই থাকে না। তবে এও দেখেছি ওরা না জিজ্ঞাসা করে বা অনুমতি না নিয়ে কখনো আমাদের গায়ে জল ছিটোয় না।

জল খেলা সম্বন্ধে এখানে আরো একটা কথা জানিয়ে রাখি। সাধারণভাবে বাইরের লোকদের কাছে মনে হতে পারে ওরা নির্বিচারে জল খেলা করে। কিন্তু তা ঠিক নয়। ওদের নিজেদের মধ্যে জল খেলার জন্য ব্যক্তি নির্বাচনের ব্যাপারে খানিকটা বাছ-বিচার আছে। যেমন পিসের সঙ্গে (পিসির স্বামী) কেউ জল খেলবে না। তেমনি আবার দেওর-ভাজদের মধ্যে জল খেলার বাড়াবাড়িটা কিছু বেশি, আবার শ্যালী (ছোটো) জামাইদার (বড়ো ভগিনীপতি) মধ্যেও জল খেলার আকর্ষণ দেখবার মতো। কিন্তু বড়ো শ্যালীর সঙ্গে ছোটো বোনের স্বামীর জল খেলা চলবে না। ওদের মধ্যে এইসব বাছ-বিচারের ঘটা বেশ প্রবল, সব সময় বোঝা শক্ত। মোট কথা দোল খেলার জন্য অভীষ্ট ব্যক্তি নির্বাচন অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি সম্পর্কের উপর যতটা না নির্ভর করে তার চেয়ে বেশি করে সামাজিক সম্পর্কের উপর, এই সত্যটা মনে রাখা দরকার।

এই অনুষ্ঠান পর্ব শেষ হতে হতে দিনের আলোও প্রায় নিভে আসে। তখন এক এক বাড়িতে হাঁড়িয়ার কলসি সামনে নিয়ে বসে সান্ধ্য আড্ডা। সেই সঙ্গে অবশ্যই থাকে কিছু 'গজক' অর্থাৎ বাংলা ভাষায় যাকে বলে চাট্, মদের সঙ্গে টুকিটাকি উপকরণ। 'গজক' না হলে যেমন পান জমে না তেমনি হাঁড়িয়ার আড্ডায় হাসি ঠাট্টা অপরিহার্য। এই পান পর্বই হচ্ছে এই পরবের শেষ পর্ব।

খুব ঘটা করে না হলেও সন্ধেবেলা হাঁড়িয়া খাওয়া হয়, এটা সত্য ঘটনা। কেউ কেউ বলে, মনে হয় বিশ্বাসও করে, এই মদ খাওয়াটা পরবের অঙ্গ নয়। এ সম্বন্ধে আর একটি মত বাহা পরবেও মদের স্থান আছে। এই দুই প্রায় পরস্পরবিরোধী মত শুনে মনে প্রশ্ন জাগে যে পূজানুষ্ঠানে, চৌহদ্দির মধ্যে হাঁড়িয়ার প্রবেশ নেই, সেই পরবেই আবার হাঁড়িয়ার স্থান হয় কি করে ? এই পরস্পরবিরোধী দুটি তথ্যকেই যদি স্বীকার করতে হয় তাহলে একথা মেনে নিতে হয় যে, উৎসবের দুটি দিক আছে। একটা ধর্মীয় দিক, পূজানুষ্ঠান আচার-বিচার যেখানে প্রধান ; আর একটি সামাজিক দিক। এক্ষেত্রে তাহলে এও মেনে নিতে হয় যে একই পরবের দুটো দিকের মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মীয় দিকটা যদি অনমনীয় হয়, তাহলে সামাজিক দিকটায় পরিবর্তন বেশি করে দেখা দেবে। সাঁওতালদের বর্তমান সমাজে এই সমস্যাটা মনে হয় দেখা দিয়েছে। একথা বলছি তার কারণ এ বছরের এই বাহা পরবের সূত্রেও খানিকটা নজির আমি পেয়েছি।

কিছু মাতব্বর ও কিছু যুবক এই দুই দলের কাছেই আলাদা-আলাদা করে যখন জানতে চেয়েছি এই বাহার মধ্যে হাঁড়িয়া বা মদ খাওয়ার সম্পর্কটা কিরূপ, তখন প্রথম দল একবাক্যে বলেছে হাঁড়িয়া বা মদ খাওয়াটা বাহা পরবের সঙ্গে যুক্ত নয়। তারা হাঁড়িয়া আজ খাচ্ছে ঠিকই, তবে সেটা সারাদিন খাটুনির পর মদটা খেলে যেমন গতরটায় আরাম লাগে, সেইজন্য খাওয়া। অতএব এটা পরবের খাওয়া নয়। তাছাড়া বাহা শেষ করে তারপর তারা হাত পা ধুয়ে মদ খেতে বসেছে। তবে সেটি পরবের খাওয়া কি করে হবে ?

দ্বিতীয় দল, অর্থাৎ যুবক দল বলছে মদ ছাড়া আমাদের কোনো পরব হয় না। অন্যানা পরব চলার সঙ্গে সঙ্গেই মদ চলে, আর 'বাহার' বেলায় পরবটা শেষ করে তারপর মদ খাই। এই যা তফাৎ।

এই শেষোক্ত মতটা নব যুবকদের মধ্যে প্রাধান্য পাচ্ছে। পরবের নামে মদ রাখার (হাঁড়িয়া তৈরির) সরকারি 'পারমিট' সহজেই পাওয়া যায় বলে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এই মতটাই চালু হয়ে যাবে। বয়স্ক ব্যক্তিদের মতটা তখন কালস্রোতে ভেসে যাবে।

তবে কি বুঝতে হবে বর্তমান সাঁওতালি সমাজ-ব্যবস্থায় প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠানের শক্তিটা ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছে ?

পঞ্চম অধ্যায়

সাঁওতালী বিবাহ : কিরিংবহু বাপ্‌লা

সাঁওতালদের বিবাহ-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার স্বল্প অভিজ্ঞতাকে এক কথায় প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয় 'বিচিত্র'। এর কারণগুলো এক এক করে বিবৃত করার চেষ্টা করব। তবে প্রথমেই একটু বলে রাখি, একদিকে বর্তমান জগতে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রগতিশীল দেশও মনে হয় এই ব্যাপারে এদের কাছে হার মানবে ; আবার অন্য দিকে অতি সংরক্ষণশীল জাতিও এদের বিয়ের অনুষ্ঠানাদি দেখে তারিফ না করে পারবে না। এই দুয়ের মাঝে আবার এমন কতকগুলি পদ্ধতি রয়েছে যেগুলো সত্যিই অভিনব। আরো আশ্চর্য লাগে, এই সবগুলি পদ্ধতিই সমাজ-কর্তৃক স্বীকৃত। এর থেকেই মনে স্বভাবতই জিজ্ঞাসা ওঠে যে, তাহলে এদের সেই সমাজ-ব্যবস্থাটা কি প্রকারের ? সেইটাই তো আগে জানা দরকার। এই প্রশ্ন মনে রেখেই আমি পূর্ববর্তী অধ্যায় তিনটিতে ধর্মানুষ্ঠানের অবতারণা করেছি। আশা করছি এদের বিবাহ-পদ্ধতিগুলি প্রকাশ পেলে আমি ঐসব প্রবন্ধে যা বোঝাতে চেয়েছি সেই বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে, ঐসব প্রবন্ধগুলিতে ধর্মানুষ্ঠানের আচার-বিচারের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থার প্রতিফলনটাই ছিল মুখ্য। এবারে প্রধানত বিবাহ-পদ্ধতির পরিবর্তন কোন্ দিকে কিভাবে এগোচ্ছে বা মোড় নিচ্ছে, তার মাধ্যমে সমাজের বুকে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেইটাই জ্ঞাতব্য।

বর্তমানে আট দশ রকমের বিবাহ-পদ্ধতির চল রয়েছে দেখা যায়। এর মধ্যে যে পদ্ধতিটি সবচেয়ে বেশি মর্য্যাদা পেয়ে থাকে সেটার কথাই আগে বলব। হিন্দু বা মুসলমান যারা প্রাচীনপন্থী তাদের কাছে এই পদ্ধতিটিই বিশেষ গুরুত্ব পাবে। এই বিয়েতে সাধারণত কথাবার্তা শুরু হয় ঘটক বা ঘটকী মারফৎ। সাঁওতালদের মধ্যে পেশাদারী ঘটকের ব্যাবসা এখন খুব মন্দা। কারণ জিজ্ঞাসা করলে ওরা অনেক কথাই বলবে। তার মধ্যে আমরা যাচ্ছি না, ঘটকদার এসে খবর নেয় ছেলের বিয়ে দেবে কিনা। ওরা আগে ছেলের বাড়িতেই খোঁজ করে দেখছে। যদি ছেলের অভিভাবক রাজি থাকে তখন ঘটকদার তার ঝোলা থেকে

একটি একটি করে মেয়ের ফর্দ বের করে। ঐসব শুনে ছেলের অভিভাবক যদি আগ্রহী হয়, তখন দেখাদেখি, পছন্দ-অপছন্দের অধ্যায় শুরু হয়। এই অধ্যায়ের শেষে একটি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট হয়। এটা ছেলের তরফ থেকেই প্রস্তাবিত হয়। এই অনুষ্ঠানটির নাম 'মনামনি'। নিয়ম অনুযায়ী এটি মেয়ের গ্রামের অনতিদূরে কোনো বনে বা বাগানের মধ্যে নির্জন পরিবেশে হবে। যেখানে উভয় পক্ষের কিছু কিছু লোক উপস্থিত থাকবে। এই অনুষ্ঠানে স্ত্রীলোকেরাই সর্ব বিষয়ে অগ্রণী। সঙ্গে যে দু'চার জন পুরুষ থাকে অনুষ্ঠানের মধ্যে তাদের কোনো ক্রিয়াকলাপ নেই। ভাবী বরই একমাত্র পুরুষ যার সমাদরের বহর দেখবার মতো। অবশ্যই বর ও কনে উভয়কেই সমান সমাদর দেখানো হয়। বরের আদর সবচেয়ে বেশি কন্যাপক্ষের মেয়েদের কাছে, আর কনের আদর বরপক্ষের কাছেই সর্বাধিক। উভয় পক্ষ থেকে যারা যারা আসে তাদের মধ্যে সাধারণত থাকবে কাকীমা, বৌদি, পিসিমা, বড়দিদি ইত্যাদি। এক এক পক্ষ থেকে আট-দশ জন করে আসবে।

প্রথমে বরপক্ষ একটি পরিষ্কার জায়গায় বৃত্তাকারে বসবে। বৃত্তের একদিকে বর ও একদিকে কনে, কিছু লোকের তত্ত্বাবধানে থাকবে। জিনিসপত্রের মধ্যে প্রধান মুড়ি এবং সরিষার তৈল বা 'সুনুম্'। একজন মহিলা বৃত্ত থেকে এগিয়ে এসে বসবে এবং এক হাঁটুর উপর ছেলেকে এবং অপর হাঁটুর উপর মেয়েকে বসিয়ে হাতে, পায়ে, গায়ে, মাথায় তেল মাখিয়ে দেবে, এবং শেষে তাদের আঁচলে বা গামছায় কিছুটা মুড়ি ঢেলে দেবে। সবশেষে ঐ মহিলা বর-কনেকে আশীর্বাদ করবে গলায় একগাছি করে মালা পরিয়ে দিয়ে। মালা ছাড়া নগদ টাকা-পয়সাও অনেকে আশীর্বাদী হিসাবে দিয়ে থাকে। এইভাবে উপস্থিত সকল মহিলাই বর-কনেকে আশীর্বাদ করবে। এই অনুষ্ঠান শুরু হয় দ্বিপ্রহরে শেষ হতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়।

সমস্ত অনুষ্ঠানটি আমাদের কাছে সরল, স্বাভাবিক এবং রুচিসম্পন্ন অথচ অনাড়ম্বর ; কিন্তু এতই হৃদয়গ্রাহী মনে হয়েছে যে মুগ্ধ বিস্ময়ে শুধু দেখেই মনটা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে নবদম্পতির কল্যাণ-কামী হয়ে পড়ে।

এই অনুষ্ঠানটি যখন চলতে থাকে উভয়পক্ষ গলা মিলিয়ে গানের

লহর গেঁথে চলে। মনামনির পালা শেষ হলে উভয়পক্ষ মিলে বিয়ের তারিখ ঠিক করবে। এটা হল প্রস্তুতিপর্ব। অবশ্য মনামনিতে রাজি হবার আগেই অভিভাবকরা লেনদেনের ব্যাপারটা ঠিক করে নেয়। যেমন লেনদেনের সম্বন্ধে কথা বলার আগে ঠিক হয় জাতি, শ্রেণী ইত্যাদি নির্বাচন। এগুলিকে ধরলে 'মনামনি'কে তৃতীয় কি চতুর্থ পর্ব'ও বলা চলে।

এখানে একটা কথা বলে রাখি, সাঁওতালদের বিয়েতে মেয়ের জন্য বরপক্ষ কন্যার পিতাকে কিছু অর্থ দেবে, এটাই নিয়ম ; অর্থাৎ মেয়েকে কিনে নিতে হয়। এতে কন্যাকুল গৌরবান্বিত হয়। এই পদ্ধতিতে মোট বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা কন্যাপণ দিতে হয়। এই থেকে পঞ্চাশ পয়সা কন্যার পিতা পঞ্চায়েতকে দেবে। এটা সম্মানী অর্থ। বাকিটা তার নিজের পাওনা। মেয়েকে কিনে নেওয়াতে কন্যাপক্ষ গর্বিত, কিন্তু তাই বলে এই গর্ব বা সম্মানের সঙ্গে ওরা টাকার অঙ্কটা বাড়ানো কমানোর কথা চিন্তা করে না। মেয়ে যে এমনি পাওয়া যায় না ; তাকে মূল্য দিয়ে কিনতে হয় এবং মেয়ে যে সমাজে সমাদৃত এই বোধটা ওদের খুব টনটনে। ওরা আমাদের বলে, "তোমাদের ছেলে তো তোমাদের মেয়ের বাপের কাছে বিক্রি কর ; আর আমাদেয় মেয়ে ছেলের বাপকে কিনে নিতে হয়।"

বিয়ের আগে 'লস্‌মিদা' (পাকা দেখা) বলে আর একটি অনুষ্ঠান কচিৎ-কখনো হতে দেখা যায়। যথেষ্ট সম্পন্ন ঘর ছাড়া এই অনুষ্ঠান করে না, কারণ এতে খরচ অনেক।

এরপর প্রাক্-বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু হয় বিয়ের আগের দিন, ছেলের বাড়ি এবং মেয়ের বাড়ি উভয় জায়গাতেই। এই অনুষ্ঠানকে ওদের ভাষায় বলে "সুনুম্-সাসান" আক্ষরিক বাংলা 'তেল-হলুদ', আমরা যাকে বলি 'গায়ে-হলুদ'। এদের এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য আছে। এটা শুরু হয় সন্ধ্যার পর। সারারাত ধরে এই পর্ব চলতে থাকে। তিনজন কিশোরীকে নির্বাচন করা হয় এই কাজের জন্য, এদেরকে বলে "তিত্‌রী-কুড়ী"। প্রথমে পঞ্চায়েতের সব সভ্যদের খবর দিয়ে কনের বাড়িতে আনা হবে। তাদের মধ্যে নায়েকে-কে সর্বপ্রথম নির্বাচন করা হবে। এই 'তিত্‌রী কুড়ীরা' নায়েকের পায়ে সরিষার তেল ও হলুদ (কাঁচা হলুদ বেটে) মাখিয়ে দেবে। এরপর এক এক করে পঞ্চায়েতের সব সভ্যদের অনুরূপভাবে

তেল হলুদ মাখাবে। তারপরে গ্রামে যতগুলি পরিবার আছে প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী আসবে তাদের প্রত্যেককে যথারীতি 'সুনুম-সাসান' মাখানো শেষ হলে এই অনুষ্ঠানের শেষ হবে। ওদিকে রাত্রিও শেষ হয়ে দিনের আলো দেখা দেয়।

বিয়ের প্রথম দিনের অনুষ্ঠান কন্যাপক্ষের বাড়িতে শুরু হয় দেরিতে। তার সবিশেষ বর্ণনা পরে দেব। বরপক্ষের প্রথম অনুষ্ঠান ছেলের স্নান করানো এবং তার আনুষঙ্গিক আচার-বিচার সকালে শুরু হয়। এই অংশের সবিশেষ পরিচয়ও ঐ মেয়ের বাড়ির অনুরূপ, তাই এর পরিচয়ও কন্যাপক্ষের সঙ্গেই এক সঙ্গে জানা যাবে। বরপক্ষের দ্বিতীয় পর্ব থেকে আমি এখন শুরু করছি।

ছেলের গ্রাম থেকে বরকে সঙ্গে নিয়ে আসবে গ্রাম থেকে সংগৃহীত কয়েকজন পুরুষ। এর সংখ্যা কত হবে সেটা মোটামুটিভাবে উভয়পক্ষের মধ্যে একটা বোঝাপড়া আগেই হয়ে থাকে। গ্রামের বাইরে থেকেও লোক থাকবে, যেমন ছেলের মামা, ভগ্নীপতি, পিসে, মেসো ইত্যাদি স্থানীয় ব্যক্তিরা। ছেলের দাদাও অবশ্যই থাকবে। আর থাকবে ঘটক এবং নিতবর, যাকে ওদের ভাষায় বলে 'লম্‌তা'। আর একটি চার-পাঁচ জনার দল, বাজনাদারের দল, এরা বরযাত্রীদের আগে বাজনা বাজাতে বাজাতে রওনা হবে। সাঁওতালি ভাষায় বরযাত্রীদের বলা হয় ভারীয়োৎ।[১]

এই বরযাত্রীর দল নিজগ্রাম থেকে এমন সময়ে রওনা হয় যাতে কনের গ্রামে বিকাল নাগাদ পৌঁছাতে পারে। কন্যাপক্ষের গ্রামে পৌঁছে বরযাত্রীর দল গ্রামের খানিকটা দূরে কোনো গাছের তলায় আশ্রয় নেবে। ঢোল কাঁসর বাজিয়ে অবশ্য তাদের উপস্থিতির কথা কন্যাপক্ষকে জানিয়ে দেবে। ঐ গাছতলাটি হবে ভারীয়োৎদের সাময়িক ছাউনি।

এদিকে বাজনার শব্দ পেয়ে কনের বাড়িতে প্রস্তুত হবার জন্য ব্যস্ততা দেখা যাবে। একদিকে কনেকে প্রস্তুত করা, অন্যদিকে বরযাত্রীদের

১ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কিছু লোকের ধারণা আছে 'ভারীয়োৎ'-এ স্ত্রী পুরুষ উভয়ই থাকে। আমি এরূপ উল্লেখ কোনো গবেষকের গ্রন্থেও দেখেছি। আমি নিজে অনেক খোঁজ করেছি, বীরভূম জেলার শ্রীনিকেতন, শান্তিনিকেতনের চারিধারের অন্তত পনেরো ষোলটি সাঁওতাল গ্রামের কোথাও ঐ মতের সমর্থন পাই নি।

আহ্বান করা, স্ত্রী-পুরুষ দুই দল দুই দিকে যাবে। বরযাত্রীদের সমস্ত দলটার পুরোভাগে থাকবে নিতবর সহ বর ও তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন। তারপর নৃত্যরত বাজনদারদের দল চার পাঁচজন। সবশেষে বাকিরা। দলটি গাঁয়ের মুখে এসে গেলে গাঁ থেকে কন্যাপক্ষের লোক এগিয়ে এসে তাদের অভ্যর্থনা জানাবে ; তাদের সকলকে গুড ও জল খেতে দেবে। এইখানে বলি রাখি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের একটা নকল যুদ্ধ (লাঠালাঠি) হতে দেখেছি। এই সময়ে কন্যাপক্ষের মেয়েরা ভারীয়োৎকে নিয়ে কিছু ঠাট্টা-মস্করা করবে। এর মধ্যে মেয়ের বাবা বর ও নিতবরকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে যাবে এবং বারান্দায় বা উঠানে পাতা পাটির উপরে বসাবে। এই সময়ে বেশ খানিকটা মজার ব্যাপার ঘটে।

কনের দিদিরা এই সময়ে বরের কাছে আসবে। তাকে তেল মাখাবে ; তার মাথার উকুন বাছবে, তার মাথার চুল বেঁধে দেবে ; সঙ্গে সঙ্গে বরকে এবং বরযাত্রীকে বাক্যবাণে জর্জরিত করবে। বাজনদাররা তাদের বাজনা ও নাচ চালিয়ে যাবে। তেল মাখানোর পালা শেষ হলে বরকে উঠোনে এনে দাঁড করাবে। তার মাথায় জল ঢেলে চান করাবে, কিন্তু চানের পর গা মোছাবে না, চুল আঁচড়াবে না। তবে তাকে হলুদ ছোপানো একখানা মার্কিন পরতে দেবে এবং তার মাথায় একটা টোপর পরাবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শোলার টোপর দেয়, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বরের বাড়ি থেকে আনা বিশেষ ধরনের কাপড় দিয়ে কোণাকৃতি করে টোপর গড়ে মাথায় পরাবে। এই টোপরকে ওদের ভাষায় বলে "শাড়াদড়হী"। বর কিন্তু দাঁড়িয়েই আছে। এখন বরের পাশে কনের ছোটো ভাইকে এনে দাঁড় করাবে। এরপর কনের ঘর থেকে একটা থালায় করে কিছু আতপ চাল আনবে। থালাটা বরের সামনে ধরবে। ঐ থালা থেকে বর ও কনের ভাই একমুঠো করে আতপচাল নিয়ে মুখে পুরবে এবং চিবোবে। এই সময়ে বরের ভগ্নিপতি বা পিসে বরকে কাঁধে নেবে এবং কনের ভাইকে কাঁধে তুলবে তার জামাইদাদা বা ভগিনীপতি। এরই ফাঁকে বর চিবানো চাল মুখ থেকে থু-থু করে কনের ভাইয়ের দুই গালে লাগিয়ে দেবে। কনের ভাইও তার মুখের চিবানো চাল বরের গালে লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করবে, কিন্তু

সেইসময়ে তাকে তার জামাইদাদা সরিয়ে নেবে। বর রেহাই পাবে।

ইত্যবসরে একটি ঘরে কন্যাপক্ষের কিছু লোক এবং বরপক্ষের কিছু লোক ঢুকেছে। সেখানে তারা মদ খাচ্ছে, গল্পগুজব করছে। ঐ ঘরে বরপক্ষ থেকে আনা একটি ঝুড়ি এনে রাখা হবে। সেই ঝুড়িতে থাকে কনের জন্য একখণ্ড বস্ত্র। ঐ বস্ত্রখানি কন্যাপক্ষের লোকেরা, স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকে পরীক্ষা করে দেখবে এবং তাদের মন্তব্য সকলকে শোনাবে। বলাই বাহুল্য ঐ মন্তব্যগুলি বরপক্ষকে শোনাবার জন্যই বলা হয়। সবই সমালোচনামূলক মন্তব্য, ঠাট্টা তামাসার সুরটিই প্রধান।

ঐ বস্ত্র মেয়েটি বিশেষ এক ধরনে পরবে। আঁচলটি কোমরে এমনভাবে গুঁজবে যাতে সেখানে একটি ঝুলন্ত ঝোলা মনে হবে। ঐ আঁচলে মেয়ের মা কিছুটা ধান ঢেলে দেবে। ঐ ঘরের মধ্যে (সাঁওতালদের সব মূল ঘরের মধ্যেই থাকে) এক প্রান্তে নিচু দেয়াল-ঘেরা একটু জায়গা থাকে, যাকে ওরা বলে 'ভিতর'—সেই 'ভিতর'কে সামনে রেখে কনে দাঁড়াবে, সেখানে হাঁটু গেড়ে বসবে কিছুক্ষণ, তারপর নিবেদন করার মতো করে আঁচলের ধানগুলো মেঝেয় ঢেলে দেবে, উঠে দাঁড়িয়ে 'ভিতরে'র বোঙাকে প্রণাম করবে। ঘুরে এসে উপস্থিত নিজের গুরুজনদের সকলকে জোহার করবে। সবশেষে যে ঝুড়িটা করে কাপড় আনা হয়েছিল সেই ঝুড়িটাকে জোহার করবে। তারপর ওটাকে ডান পা দিয়ে স্পর্শ করবে এবং সর্বশেষ ঐ ঝুড়িতে উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখবে এবং পা মুড়ে ঐ ঝুড়ির ভিতরে বসবে। এই অবস্থায় গায়ের কাপড় দিয়ে আপাদমস্তক মুড়ি দেবে। কেবল দু'টি হাতের আঙুলগুলি দেখা যাবে। ডান হাতে একটি কাজললতা বা "কাজরাটি" ধরবে এবং বাঁ হাতে ঝুড়ির কানাটা ধরে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করবে। ঐ কাজললতাটি এতক্ষণ হয় মেয়ের কোমরে গোঁজা ছিল, নয়তো মালার মধ্যে ঝোলানো ছিল। এতক্ষণে ঘরের মধ্যেকার কাজ শেষ হল।

এরপর মেয়ের ভগিনীপতি কনেশুদ্ধ ঝুড়িটি তুলে নিয়ে দরজা পর্যন্ত নিয়ে যাবে; সেখান থেকে বরের দাদা কনের ঝুড়িটিকে নিয়ে নেবে। আজকের দিনটাতেই ছোটভাইয়ের স্ত্রীকে ছুঁতে দোষ নেই। ওদিকে বরের জনৈক ভগিনীপতি বা 'জামাইদাদা' বরকে কাঁধে চাপিয়ে নেবে। বর ও কনেকে এই অবস্থায় পাশাপাশি রাখবে। আগে থেকেই একটি

ঘটিতে জল রেখে তার মুখে পাঁচটি আমপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা আছে। ঐ ঘটির মুখে আমপাতার বোঁটা ধরে কনে অন্যদের সাহায্যে (কেন না তখনো তার চোখ মুখ ঢাকা) বরের কাঁধে ছিটোবে। বরও ঐ পাতা দিয়ে ঘটির জল কনের মাথায় ছিটিয়ে দেবে। এই সময়ে মুখের কাপড়টা কিছুটা শিথিল করা হয়। এরপর পাঁচটি শালপাতা মোড়া সিঁদুরের একটি মোড়ক বরের বাবা ছেলের হাতে দেবে। বর ঐ মোড়কটি বাঁ হাতের তালুতে নিয়ে ঐ হাতটি কনের মাথার উপরে রাখবে এবং ডান হাত দিয়ে মোড়কটি খুলবে এবং বুড়ো আঙুল ও কড়ে আঙুলের সাহায্যে একটু সিঁদুর নিয়ে প্রথমে একটু মাটিতে ফেলবে। দ্বিতীয়বার ঐ একই ভাবে সিঁদুর তুলে কনের সিঁথির নীচের দিক থেকে শুরু করে টিকির কাছাকাছি টেনে দেবে। এইভাবে তিনবার সিঁথিতে সিঁদুর দেবে। বাকি যে সিঁদুরটুকু পাতায় থাকবে সেটুকু পাতাশুদ্ধ সিঁথিতে মাখিয়ে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের মাথায় 'টুটুরি' অর্থাৎ ঘোমটা টেনে দেবে। ঐ পাতাটা বর হাতে ধরে থাকবে। অন্যরা ওটা ফেলে দেবার জন্য প্ররোচিত করবে কিন্তু সে ফেলবে না, পরন্তু বর ঐ পাতাটা তার বাবার হাতে দিয়ে দেবে।

এই পর্যন্ত যখন শেষ হল তখন বরপক্ষের কুটুম্বদের এবং কন্যাপক্ষের গোষ্ঠিবর্গের ও কুটুম্বদের খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু আজকের বিয়ে শেষ হতে এখনো একটি পর্ব বাকি আছে। সেটা এবারে বলছি।

ওদিকে যখন খাওয়া ও খাওয়ানো নিয়ে বিয়ে-বাড়ি ব্যস্ত, সেই সময়ে দেখা যাবে বর কনে ও লামৃতা অন্য কয়েকজন সঙ্গী সহ গ্রামের 'কুলি'-তে দাঁড়িয়ে আছে। এই পথে অপেক্ষমান আজকের সম্মানিত অতিথিদের কাছে মেয়ের মা জলের পাত্র নিয়ে এগিয়ে আসবে। ঐ পাত্র থেকে জল নিয়ে প্রথমে জামাইয়ের পা ধুইয়ে দেবে ; তারপরে ধোয়াবে নিজের নবপরিণীতা মেয়ের পা এবং সবশেষে তাদের ছোট্ট সঙ্গী নিতবরের পা। এর পর জলটা বদলে নিয়ে এসে ঐ তিনজনের মুখও পরিপাটি করে ধুইয়ে দেবে কনের মা।

তারপর আসবে দুটি ঠোলাতে গুড়। একটি ঠোলা (পাতার ঠোঙা) থেকে গুড় নিয়ে মা মেয়ে ও জামাইকে খাওয়াবে এবং অন্য ঠোলাটির গুড়টুকু খাওয়াবে লামৃতাকে। গুড় খাওয়ানোর পর অবশ্যই জল পান

করানো হবে। এইখানেই শেষ নয়। এবারে তিনজনার পায়ে পরিপাটি করে তেল মাখিয়ে দেবে ঐ মা। তেল মাখানো শেষ হলে পাতায় মোড়া সিঁদুর নিয়ে তিনজনকে তিনভাবে সিঁদুর পরাবে। তারপর একটা কাঁচা শালপাতার থালায় করে আগুন আসবে এবং ঐ সঙ্গে একটা মোটা কাঠের খেঁটে বা ডাণ্ডা। এই মোটা ডাণ্ডাটির একপ্রান্ত একহাতে ধরে আগুনের চারদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে প্রান্তভাগটা আগুনে তপ্ত করবে, অন্য হাতের চেটোটা 'আদাব' করার মতো করে নিজের কপালের সামনে তুলবে। পরের বারে অন্য হাতে ডাণ্ডাটি ধরবে এবং আগুনের চারধারে ঘোরাবে ও গরম করবে ও অপর হাতটা দিয়ে 'আদাব'-এর অনুরূপ আচরণ করবে। এমনি করে পাঁচবার কনের সামনে এবং পাঁচবার লাম্‌তার সামনে অনুষ্ঠান করবে। শেষবারে ডাণ্ডাটি আগুনে ঠেকিয়ে পাশে রেখে দেবে। এই ক্রিয়াকলাপ দেখে মনে হয়েছে এটি বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাবিশেষের আশীর্বাদ করার একটি পদ্ধতি। সকলের এতে অধিকার নেই। যাদের আছে এবং যাদের ইচ্ছা আছে তারাই এইসময়ে এখানে উপস্থিত থাকে। এরা সারাদিন ধরে এখনো উপবাসী। এই অনুষ্ঠান শেষ করে তবে এদের ছুটি। কনের মা ছাড়া বড়োদিদি, কাকীমা-পিসিমা প্রভৃতিরা অবশ্যই এই অনুষ্ঠানের অধিকারী।

এই অনুষ্ঠান শেষে বর কনের দিদির বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা ধরবে দিদি তখন তাকে ঘরের ভিতর নিয়ে যাবে। কনে ও লাম্‌তা পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকবে। ঘরে ঢুকে দিদি একটি জলভর্তি ঘটি হাতে তুলে নেবে এবং ঘরের মধ্যে গোল হয়ে তিনপাক ঘুরবে। ঘোরার সময় মাঝে মাঝে একটু একটু করে জল ঘটি থেকে ফেলবে মেঝেয়। তারপর মেঝেয় পাতা তালাই বা চাটাইয়ে সকলে বসবে এবং সকলকে মদ বা হাঁড়িয়া পরিবেশন করা হবে। এই আনুষ্ঠানিক মদ খাওয়ানোর পর ওদের ভাত-তরকারি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হবে। খাওয়া শেষে বর ও নিতবর বাইরে বেরিয়ে যাবে। কনে থাকবে ঘরের ভিতরে।

এই সময়ে বাইরে শুরু হবে নাচ, গান, বাজনা। উপস্থিত কিশোরী ও যুবতীরাই বিশেষ করে এই নাচ গানে মাতে। যুবকরা বাজায় বাজনা। অনেক সময় তারা কনেকে ঘরের ভিতর থেকে টেনে নিয়ে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে দেয়।

এই নৃত্যপর্ব শেষ হলে যে যার জায়গায় চলে যাবে। সূর্যোদয়ের আগে বর-কনেতে আর দেখা হবে না।

বিয়ের প্রথম দিনের শুরু। প্রথমেই জানিয়ে রাখি বিয়ের প্রারম্ভে বর ও কনে উভয়ের বাড়িতে একই রকমের আচার-অনুষ্ঠান হয়, বিশেষ কোনো ভেদাভেদ নেই। কনের বাড়িতে তার আত্মীয়-স্বজনরা থাকবে, ছেলের বাড়িতে বরের আত্মীয়-স্বজনরা, এই যা তফাৎ। অনুষ্ঠানের উপকরণাদি সবই এক। উদ্দেশ্য তো বটেই। এজন্য আমি কেবল একটা বাড়ির অনুষ্ঠানই— ধরুন মেয়ের ঘরের— কিভাবে ঘটছে সেইটাই বলব। পাঠক অন্য বাড়ির অর্থাৎ ছেলের ঘরের ঘটনাগুলো কল্পনা করে নেবেন। একান্ত দরকার যেখানে হবে সেখানে অবশ্যই বিশেষ করে উল্লেখ করব।

মেয়ের বাড়ি অনুষ্ঠান শুরু হয় দেরিতে। বরযাত্রী গ্রামপ্রান্তে পৌঁছবার সাড়া পেলে তখন কনেকে প্রস্তুত করার জন্য সাড়া পড়ে যায়। বিয়েতে পুরোহিতের করণীয় কিছু নেই। অর্থাৎ ধর্মানুষ্ঠানে আমরা পুরোহিতের যে ভূমিকা দেখেছি এখানে সেই অনুপাতে বিয়ের সময় তার ভূমিকা যৎসামান্য। দরকারি ভূমিকা যেটুকু আছে তা হল জগ্-মাঝির। জগ্-মাঝি একজন পঞ্চায়েত সভ্য, মাঝি বা সর্দারের ডান হাত। বিয়ের সমস্ত ব্যাপারটাই গ্রামের মাতব্বরদের পরামর্শ নিয়ে ঠিক হয়েছে, সকলেই জানে। আগের দিনে তেলহলুদ-অনুষ্ঠানে তো সেটি সর্বতোভাবে পাকা হয়ে গেছে। তবু বিয়ের দিন কোনো অনুষ্ঠান শুরু করার আগে জগ্-মাঝির কাছে আর্জি পেশ করতে হবে ঃ অনুমতি করুন আমরা মেয়েকে চান করাব।

এই চান করানো অনুষ্ঠান হবে 'বাগডী'-তে, অর্থাৎ কনের বাপের বাড়ির বাস্তুসংলগ্ন বাগানে। অনুমতি পেলে উপস্থিত সকলে একদফা মদ বা হাঁড়িয়া খেয়ে নেবে এবং বাগ্‌ডীতে গিয়ে পুরুষরা একটা খাল কাটবে। মেয়েরা নাচতে শুরু করবে। মেয়ের বাবা, মা এবং ঐ পর্যায়ের ব্যক্তিরা বাগ্‌ড়ীতে যাবে। স্ত্রীলোকদের দলে মোট পাঁচ জন (বেশিও হতে পারে, তবে সংখ্যা বিজোড় হতে হবে) ঐ খালটিকে প্রদক্ষিণ করবে এবং তাদের কেউ কেউ ঐ গর্তের মধ্যে জল ঢালবে তাদের হাতের ঘটি থেকে। ঐখানে একটি তীর, একটি লম্বাটে ধারালো অস্ত্র যন্ত্র ওদের ভাষায় এর নাম 'তাড়োয়াডী'—আমাদের ছোটো আকারের খাঁড়ার অনুরূপ, এবং একটি

ঘটি এক জায়গায় রাখা থাকবে। প্রত্যেকে এক একটি জিনিস নিয়ে প্রথমে আকাশের দিকে দেখাবে পরে নীচে ঐ খালটির দিকে দেখাবে, তারপর যথাস্থানে রেখে দেবে।

এদিকে জগ্‌মাঝি খালটা ঘিরে তিনটি জামের ডাল পুঁতবে এবং ঐ জামের খুঁটি ঘিরে খানিকটা সাদা সুতো জড়াবে। খালের পাড়ে মাটিতে এক জায়গায় সিঁদুর লাগাবে। একটি বড়ো কাঁসার বাটিতে এক বাটি মদ ও কয়েকটা শালপাতার তৈরি পাত্র (ঠোলা) আনবে। একটি ঠোলাতে মদ ঢেলে ঐস্থানে বোঞআর উদ্দেশে নিবেদন করবে। বাকি মদটুকু উপস্থিত পুরুষরা ভাগ করে খাবে। মদ খাওয়া শেষ হলে খুঁটি থেকে ঐ সুতোটা খুলে নেবে।

এই সময়ে পূর্বোল্লিখিত 'তিত্‌রি-কুড়ীরা' দু'টি মাটির কলসি নিয়ে আসবে। ঐ কলসির মধ্যে কিছুটা মুড়ি ও কয়েকটা করে পয়সা থাকে। জগ্‌মাঝি ঐ কলসি দুটি ওদের কাছ থেকে চেয়ে নেবে এবং কলসি-মধ্যস্থ মুড়ি ও পয়সা ওদের দিয়ে দেবে। কলসি দুটিতে জল ভর্তি করে জগ্‌মাঝি মাটিতে বসিয়ে দেবে। তিনজন 'তিতরি-কুড়ী'র মধ্যে দু'জন কলসি দু'টি সামনে নিয়ে মাটিতে বসবে। তারপর প্রথমে হাঁটুর উপরে কলসি দুটি তুলবে, সেখান থেকে তুলবে মাথায় এবং আবার মাটিতে নামাবে। আবার আগের মতো করে মাথায় তুলবে এবং উঠে দাঁড়াবে।

এই অনুষ্ঠানে জগ্‌মাঝি পায় একখণ্ড পাঁচগজের মার্কিন কাপড়। এই কাপড়টি ভাঁজ করে সে কিশোরীদের মাথার উপরে জলভর্তি কলসি দুটির মুখ ঢেকে দেবে। তখন কিশোরীরা ঐ কলসি নিয়ে কনের বাড়ির উঠোনের দিকে যাবে ; যেখানে গতকাল শালের ডাল দিয়ে ছোট্ট একটা ঘেরা জায়গা করা আছে যেটাকে সাঁওতালি ভাষায় বলে 'মাণ্ডোয়া', সেখানে কলসি দুটো নামিয়ে দেবে। দুজন মাত্র এই কাজটা করলেও থাকবে কিন্তু ওরা তিনজন। ওদের আরো কাজ আছে।

এই 'তিত্‌রি-কুড়ী'-বা এবার কনেকে তেল মাখাবে। ওদের তেল মাখানো শেষ হলে কনের মা আবার মাখাতে বসবে। ইতিমধ্যে পুরুষরা একটি গোরুর জোয়াল ঐ বাগড়িতে খালের উপর আড়াআড়িভাবে লাগিয়ে আসবে। তেল মাখানো শেষ হলে কনেকে বাগড়িতে নিয়ে যাবে। কনের মা, বাবা ও আত্মীয়-স্বজনরাও বাগড়িতে যাবে। ঐ খালটির

একদিকে কনে, তার মা ও তার বাবা এক লাইনে দাঁড়াবে। বাঁ-দিক থেকে প্রথমে বাবা, মধ্যে কনে এবং দক্ষিণে মা। মা ও মেয়ে বসবে, বাবা দাঁড়িয়েই থাকবে। এবারে বাবা পূর্বোল্লিখিত খাঁড়া বা বগি বা 'তাড়োয়াড়ী' খানা তার মাথার উপরে তুলে ধরে থাকবে, মা ও মেয়ে জোড়হাত করে বসে থাকবে। জগমাঝি খাঁড়ার উপর জল ঢালতে থাকবে, ঐ জল কনের মা ও কনে আঁজলা ভরে খাবে এবং হাত দুটো মাথায় মুছবে। এরূপ একবারই করবে, এরপর বাবা ও মা স্থান ত্যাগ করবে। তাদের জায়গায়, তাদের স্থলাভিষিক্ত অন্য কোনো স্বামী-স্ত্রী অনুরূপভাবে আচরণ করবে। এইভাবে মা-বাবার ন্যায় মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা একের পর এক অনুরূপভাবে কাজ করে যাবে। এই পর্ব শেষ হলে কনে ও তার দিদিরা ও 'তিতরি-কুড়িরা' ছাড়া আর সকলে ঐ স্থান ত্যাগ করবে। দিদিরা পূর্বোল্লিখিত দুই কলসি জলের একটি কলসি আনবে। কনেকে খালের উপরে পাতা জোয়ালের উপর দাঁড় করাবে এবং ঐ কলসির জল দিয়ে কনেকে চান করাবে। দরকার হলে পরে অন্য পাত্রের জলও নিতে পারে। এরপর কনেকে তার বাড়ির দেওয়া পাড়-ওয়ালা একখানা নতুন শাড়ি পরাবে। এরপর 'তিতরি-কুড়ি'-দের প্রস্থান। কনে থাকবে দাঁড়িয়ে। আসবে জগ্‌মাঝি। ঐযে আগে খানিকটা সাদা সুতো তিনটে খুঁটি ঘিরে লাগিয়েছিল সেই সুতোটাই দণ্ডায়মানা কনের বাঁ-পায়ের (আঙুলের) থেকে শুরু করে কোণ বেড করে তিন-চার বার ঘুরিয়ে বাঁধবে— লম্বাভাবে সুতোর খি-গুলো থাকবে।

তিতরি-কুড়িদের পুনঃপ্রবেশ, হাতে কিছু আতপ ধান ও আমপাতা। ওরা তিনজনই জগ্‌মাঝির নির্দেশমত বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠ আঙুলের নখের সাহায্যে খুঁটে-খুঁটে আতপ চাল বার করে আম পাতাতে রাখবে। জগ্‌মাঝি ঐ চালের সঙ্গে ছোটো এক টুকরো কাঁচা হলুদ যোগ করে পাঁচটি আমপাতা দিয়ে মুড়বে এবং কনের পা থেকে কানের সঙ্গে যুক্ত ঐ সুতোটা খুলে নিয়ে এই আমপাতার মোড়কটা পরিপাটি করে বাঁধবে। সবশেষে ঐ মোড়কটি কনের ডান হাতের কব্জিতে বেঁধে দেবে। এইটা মেয়ের হাতে সাধারণত চার-পাঁচ দিন থাকে। সময় হলে শ্বশুরবাড়ির জগ্‌মাঝি আবার খুলে দেবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বরের হাতে অনুরূপভাবে ঐরূপ একটি মোড়ক বাঁধা হয়েছে। সেই অবস্থায় বর বিয়ে করতে এসেছে। সেটিও

সময়মত ঐ একই দিনে খোলা হবে।

এতদূর হলে মেয়ে বিয়ের কনে হিসেবে প্রস্তুত হল!

এর পরের ঘটনা তো আগেই বলেছি।

এখন মেয়ের বাড়িতে দ্বিতীয় দিনে কি ঘটছে দেখা যাক্। এখানে বলে রাখি দ্বিতীয় দিনে ছেলের বাড়ি তো প্রায় ফাঁকাই থাকে। তাই উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা নেই। বর-কনের ফিরতে সেই বিকেল। অনেক সময় সন্ধ্যা হয়ে যায়। তারপর যেটুকু চাঞ্চল্য দেখা যায় সে কথা যথাসময়ে বলব।

দ্বিতীয় দিনে কনের বাড়িতে বিদায়ের প্রস্তুতি চলতে থাকে। তাই বলে কোনো করুণ দৃশ্যের অবতারণা করতে দেখা যায় না; অন্তত ঘরেব বাইরে তো নয়ই। বাইরে বরং উল্টোটাই ঘটে। সেই কথাই এখন বলব।

অতিথিরা প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে মাণ্ডোয়ার ধারে কাছে এসে জমতে থাকবে। সকলে এসে পোঁছোলে প্রথমেই তাদের মদ দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। একদিকে যখন মদ বা হাঁড়িয়া পান চলে অন্যদিকে তখন বিচিত্র ধরনের প্রসাধন-দ্রব্যাদি এসে জমা হয়। এই দ্রব্যগুলি হল: ছোটো একটি আয়না, চিরুনি, সিঁদুর ও হাঁড়িয়া ভূষো কালি দিয়ে তৈরি কাজল ইত্যাদি। সাজবে কনের মা বাদে স্ত্রী-কুলবতীরা। মদ্যপানান্তে অপেক্ষমান অতিথিদের সামনে বটপাতা (শালপাতা নয়) পেতে তাতে হাঁড়িয়ার গাদ (যা গোরু-বাছুরের খাদ্য) খানিকটা করে পরিবেশন করা হবে। পান করার জন্য জল দেবে এমন ফুটো পাত্রে যাতে জলটা ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে অতিথির গায়ে পড়ে। এরপর বিচিত্র সাজে চিত্রিতা কুলবতীরা এক এক জন করে কুটুমদের সামনে আবির্ভূতা হবে। প্রথমে যে সক্রিয় হবে তার বাঁ কাঁখে থাকবে একটি ভেড়ার শিশু। এই শিশুটি বিচিত্র পরিবেশে ধৃত অবস্থায় প্রবল আপত্তি জানাবে, অর্থাৎ কাঁদবে। কুলবতী অতিথিদের সামনে গিয়ে যথারীতি জোহার করবে, জনে জনে। চলে আসবার আগে হঠাৎ ঘুরে কোনো এক অতিথির সামনে এসে তাকে উদ্দেশ করে বলবে— বাচ্ছাটা কাঁদছে একটু কোলে নিতে পার না? এই বলে তার দিকে বাচ্ছাটাকে ছুঁড়ে দেবার ভান করবে। অট্টহাসিতে চারদিক ফেটে পড়বে। অথ প্রথমার নির্গমন!

এরপর ঢুকবে দ্বিতীয়া। সারিবদ্ধ অতিথিদের এক এক জনকে সে

জোহার করে যাবে। প্রত্যেক অতিথি প্রতি-জোহার করবে তাদের মাথাটা সামনে একটু নত করে। ঐসব কুটুমদের মাথায়, প্রায় সকলের ধবধবে সাদা কাপড়ের পাগড়ি (?) বাঁধা থাকে। কুলবতীর তাক থাকে ঐসব পাগড়ির দিকে। উভয়েই উভয়ের উদ্দেশ্য জানে সেজন্য তারা সজাগ থাকে। কির তা সত্ত্বেও তখন কোনো কুটুম তার কুটুম্বিনীর কাছে ধরা পড়ে যায় তখন তার সাদা উষ্ণীষের দুরবস্থা দেখে আর একবার হাসির চোটে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়। কুটুম্বিনীর মুখের যত কালিমা, কুটুমের ফুলের মতো সাদা কাপড়ের গুণে পরিষ্কার হয়ে যায়। এইভাবে কিছুক্ষণ ধরে চলতে থাকে একের পর এক ঠাট্টা-তামাসা-হাসি-মস্করার অভিনয়।

কিছুক্ষণ পর আবার দৃশ্য বদলাবে। এবারে অভিনেত্রীরাই উপস্থিত সকলকে (বর ও কনে বাদে) হাঁড়িয়া বা হণ্ডি পরিবেশন করবে, নিজেরাও পান করবে। পানপর্ব শেষ হলে আবার পরবর্তী কাজের জন্য এগিয়ে যাবে। অতএব, এই সময়টুকুকে বিশ্রাম বলা চলে।

পরের দৃশ্যে দেখা গেল কনের বাবা একটা কুলোতে করে কিছু আতপ চাল, সিঁদুর ও একঘটি জল মাণ্ডোয়ার পাশে এনে রাখছে। আজকের জন্য যে খাসিটা মেয়ের বাবা নির্দিষ্ট করে রেখেছে সেইটা আনবার জন্য একজনকে আদেশ করবে। ওটা আনলে খাসিটাকে কিছু আতপ চাল খাওয়াবে। প্রসঙ্গত বলে রাখি সাঁওতালরা হিন্দুদের মতো হাঁড়িকাঠ পেতে ছাগল কাটে না, এমনি জমিতেই কাটে। যে জায়গায় কাটবে সেখানে একটু সিঁদুর ছুঁইয়ে দেবে ; খাসির কপালেও সিঁদুরের টিপ দেবে। মাণ্ডোয়ার পাশে বসা দুজন লোকের মধ্যে একজন বরযাত্রী। ঐ বরযাত্রী পাশে রাখা খাঁড়া বা বগিটা নিয়ে খাসিটা কাটবার জন্য উঠে দাঁড়াবে। খাঁড়া মাথার উপর তুলবে কিন্তু খাসির স্কন্ধে সে খাড়া নামবে না। সে বলি দেওয়ার অভিনয় করবে মাত্র। আসলে খাসিটা কাটবে পূর্ব-নির্বাচিত কনের ঘরের একজন। বলি শেষে কনের বাবা বলিস্থানে টাটকা রক্তের উপর একটু মদ ঢেলে দেবে। পাত্রের বাকি মদটুকু উপবিষ্ট দুই ব্যক্তিকে পান করতে দেবে। তারা মদ খেয়ে খড়ের নুটি দিয়ে ঘষে ঘষে বলির রক্তটা তুলে ফেলবে। তোলা হলে ঐ নুটি দুটি যে যার বগলে চেপে রেখে পরস্পরকে জোহার করবে।

পরবর্তী দৃশ্যে দেখা যাবে কন্যাপক্ষের জনৈকা কিছু আতপচালের গুঁড়ি দিয়ে মাণ্ডোয়ার এক পাশে একটা লাইন আঁকল। সেখানে একটা তালাই বা চাটাই পাতল। সেই চাটাইয়ের মধ্যিখানে বর-কনে ও লাম্‌তাকে বসাল। একপ্রান্তে বসল ছেলের ভগিনীপতি ও অপরপ্রান্তে বসল মেয়ের দিদি। এটা হল আশীর্বাদ করার জন্য প্রস্তুতি।

এখন বরপক্ষ থেকে আগের দিন যে ঝুড়িটা এসেছিল সেইটাতে করে আতপচাল ও দূর্বা আসবে। ঐ ঝুড়িটি একপাশে থাকবে। ওদিকে আশীর্বাদ করার যোগ্য ব্যক্তিরা ও দর্শকবৃন্দ এই দুই দল অপেক্ষমান। আশীর্বাদকদের মধ্যে থেকে এক একজন উঠে আসবে এবং ঐ ঝুড়িটা দুহাতে তুলে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে ঝুড়ি থেকে কয়েকটা আতপচাল ও দূর্বা বর-কনে ও লম্‌তার মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করবে। প্রত্যেকে আশীর্বাদ শেষে সামনে রাখা থালাতে কিছু অর্থ উপহার রাখবে। তারপর পাশে রাখা একটি বাতিতে (কেরোসিনের ডিবা) নিজের তালু দুটি উত্তপ্ত করে সেই তাপ বর-কনে ও লাম্‌তার দুই গালে স্পর্শ করাবে। একইভাবে উভয়পক্ষের যত জন আশীর্বাদক আছে তারা সকলেই অনুরূপভাবে আশীর্বাদ করবে। এই পর্ব শেষ হতে বেশ সময় লাগে।

এর পর শুরু হয় ভোজন-পর্ব। এদের চিরাচরিত নিয়ম হচ্ছে গ্রামের সমস্ত লোককে কুটুমদের সঙ্গে একসঙ্গে বসিয়ে মদ ও ভোজ খাওয়ানো। কি ছেলের বিয়েতে, কি মেয়ের বিয়েতে এই নিয়মই বহু দিন ধরে চলে আসছে। এদের গ্রামগুলি সাধারণত ছোটো-ছোটো। খাদ্যতালিকাতেও আড়ম্বর থাকে না। সেজন্য বিশেষ অসুবিধা দেখা যায় নি। কিন্তু আজকাল কিছু কিছু অসুবিধা দেখা গিয়েছে। সে কথা পরে বলছি।

এই ভোজে থাকে ভাত আর 'ইতু' অর্থাৎ তরকারি। আর ঐ যে খাসিটা কাটা হল, সেই মাংস। গ্রামের লোকসংখ্যা যাই হোক, ভাগে যতটুকু পড়ে তাতেই সকলে খুশি। পেট ভরার থেকে সম্মানটাই বড়ো। পেট ভরবার মতো ভাত-তরকারির ব্যবস্থা অবশ্যই থাকে। বর-কনেকে কিন্তু খাসির মাংস খাওয়াবে না। তাদের আলাদা করে বসিয়ে মুরগির মাংস দিয়ে ভাত খাওয়াবে আজ।

একটু আগে উল্লেখমাত্র করেছি যে, ভোজ খাওয়ানোর ব্যাপারে

আজকাল কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সেইটাই এখানে একটু বিশেষ করে বলে রাখি। বিয়েতে সামাজিক নিয়ম যেমন বরপক্ষ বা কন্যাপক্ষ গ্রামবাসীদের খাওয়াবে, তেমনি এও নিয়ম যে গ্রামস্থ প্রত্যেক পরিবার বিয়ে-বাড়িতে এক কলসি মদ উপহার হিসাবে কনের বা বরের বাড়িতে নিয়ে যাবে। সামাজিক অনুষ্ঠানে এরূপ লেন-দেন নিয়ম হিসাবে বহুদিন থেকে চলে আসছে। কিন্তু আজকাল অনেক বিয়েতে কন্যা বা বরপক্ষ থেকে ভোজ দেওয়া হচ্ছে না। কারণ প্রধানত অর্থনৈতিক হলেও সবটাই যে তাই-ই তা হলপ করে বলা যায় না। কারণ যাই হোক, এই লেন-দেন প্রচলিত থাকাকালীন বিয়ের ব্যাপারে যে সহযোগিতা, বিশেষ করে যে একাত্মবোধ ছিল সেইখানে ঘাট্‌তি দেখা দিতে বাধ্য।

কোনো কোনো গ্রামে নাকি শোনা গেছে, যদি ভোজটাই বাদ যায় তবে মদটাই বা আমরা দিই কেন? আমরা ঘরে ঘরে মদ রাখব এবং আমাদের ঘরে বসেই মদ খাব। গত বছরে আমি নিজে এরূপ মনোভাব প্রকাশ করতে শুনেছি। এরূপ মনোভাব বিস্তৃতি পেলে সাঁওতালি সমাজ-ব্যবস্থা রসাতলে যেতে বেশিদিন সময় লাগবে না। এই ব্যাপারে সমাজ-বিজ্ঞানীদের অবহিত হওয়া উচিত। অর্থনৈতিক দিকটার কথা আমি পরে বলছি।

ভোজ শেষে কন্যা বিদায়ের পালা। বরপক্ষ বাড়ি ফিরবার জন্য প্রস্তুত। প্রসঙ্গত বলে রাখি বরযাত্রীদের অনেকেই যারা নিছক বর-যাত্রী হিসেবে এসেছিল অন্য কোনো অনুষ্ঠানে যাদের করণীয় কিছু ছিল না, তারা কেউ কেউ রাত্রেই এবং অনেকে পরের দিন সকালেই চলে গিয়েছে। কাজেই বরযাত্রীর দল এখন ছোটো হয়ে গিয়েছে। তারা বাড়ি ফেরার তাড়া লাগাবে যাতে সন্ধ্যা হবার আগেই গাঁয়ে ফিরতে পারে। কন্যাপক্ষও তাড়াতাড়ি বিদায়ের পালা শেষ করতে সচেষ্ট। এই পালা খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু একটি ঘটনাতে বেশ অভিনবত্ব আছে, সেইটাই এখন বলছি।

নবপরিণীতা কন্যা, স্বামী ও তার নতুন আত্মীয়দের সঙ্গে তার নতুন গৃহে যাবে। চারিদিকে একটা করুণ আনন্দের হিল্লোল চলছে। এরই মধ্যে দেখা গেল কনের মা ও মাতৃস্থানীয়ারা যাদের

কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, তারা একান্তে যেন কিসের জন্য অপেক্ষমানা। ইত্যবসরে বাপের দিক থেকে কন্যা এল, গেল প্রথমে মায়ের কাছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তার মুখে যেন একটা কি রয়েছে। মেয়ে কি মার বুকে মুখ রেখে কাঁদছে? না। আসল ঘটনাটা হল: মেয়ের মুখে থাকে একটি টাকা। ওদের ভাষায় বলে 'নুনু-টাকা'। মেয়ে মায়ের স্তনটি ঠোঁট দিয়ে এমনভাবে চেপে ধরবে যাতে তার মুখ থেকে টাকাটা মাটিতে পড়ে যায়। এইভাবে মেয়ে মাতৃস্থানীয়া সকলের কাছে যাবে এবং অনুরূপ আচরণ করবে। অতীতে মাতৃস্তন্য পান করার মূল্য দিয়ে গেল কি মেয়ে? জানি না। আরো একটু পরে বলছি।

অনুরূপ দৃশ্য দেখা যাবে ছেলে যখন বিয়ে করতে আসবে। রওনা হবার আগে পুত্র একটি টাকা মুখে পুরে মায়ের স্তন যখন ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরবে মুখের টাকাটা মাটিতে পড়ে যাবে। এই সময় মা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করবে: ওকাতেম চালা কানা বাবু? অর্থাৎ কোথায় যাচ্ছ বাবা? ছেলে উত্তর দেবে: কাসি বাগি কাতে কড়মি আগু। এর অর্থ, তোমার কাজ করতে কষ্ট হয়, তাই বৌ আনতে যাচ্ছি।

মায়ের কাছ থেকে ছেলে তখন অপেক্ষমানা মাতৃস্থানীয়া অন্যদের কাছে যাবে এবং মুখে নুনু-টাকা নিয়ে তাদের প্রত্যেকের স্তন স্পর্শ করবে এবং অনুরূপ কথোপকথন হবে।[১]

সাঁওতাল-মা কিন্তু মুখফুটে মেয়েকে প্রশ্ন করে না। তবে ঐ সময়ে ছোটো বড়ো উপস্থিত স্ত্রীলোকেরা যে গানটি গায় সেইটিতেই মায়ের মনের কথার অনেকখানিই বলা হয়ে যায়। সেই গানটি এখানে তুলে দিচ্ছি:

সাঁওতালিতে: "তিনে ঝোলচুকু ইদিমিঞা দুলোড়ে
আম চালা আদম লেঞ টুইমে
দেন গো তোয়াদারি নিনুতোয়াইঞ।"

ভাবার্থ: মা, কত দূরের পথ যেতে হবে তোকে জানি না;
আমাকে তুই বলে যা মা,
তোকে কি আর দেব পাথেয়—
একটু বুকের দুধ খেয়ে যা।

১. হিন্দু-মা পুত্রকে বলে: বাবা তুমি কোথায় যাচ্ছ? পুত্রের উত্তর: তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি। কনের বেলায় কনকাঞ্জলির কথা স্মরণীয়।

সাঁওতাল মেয়ের মা মেয়েকে বিদায় দেবার আগে তার অাঁচলে কিছু মুড়ি দেয়, মেয়ে কিন্তু সেই মুড়ি তার "করমডার" বা বন্ধুর অাঁচলে ফিরিয়ে দেবে। এইভাবে তিনবার দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেলে বন্ধুর অাঁচলেই সে মুড়ি থেকে যাবে। কিন্তু এই আচারকে বাক্যবন্দী করার কোনো খবর আমি আজো পাইনি।

বর-কনে নিয়ে উভয়পক্ষের লোক মেয়েব গ্রাম ছেড়ে এবারে বেরোবে। মেয়ের গ্রাম থেকে পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীলোকরাও যায়। সঙ্গে কম বয়সের ছেলে-মেয়েও দু-চার জন থাকে, কোনো বাধা বা বাধ্যকতা নেই এতে। সাধারণত বিশ-তিরিশ জন লোক যায়। ছেলের গ্রামে পৌঁছে গেলে সর্বপ্রথমে কুটুমের দলকে মদ দিয়ে অভ্যর্থনা করবে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মদ খাবে। বরপক্ষের কিশোরীরা উপস্থিত কন্যাপক্ষের সকলের পা ধুইয়ে, তেল মাখিয়ে তাদের যথাযোগ্য অভিবাদন করবে। তারপর তাদের পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন গোয়ালের মধ্যে চাটাই পেতে বসাবে। এবারে বরের মা-বাবা আসবে। তারা কন্যাপক্ষের ছোটো-বড়ো সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন জানাবে। তারপর আসবে বর স্বয়ং। সেও উপস্থিত সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করবে। এটা হল প্রাথমিক অভ্যর্থনা। এরপর কিছুক্ষণের বিরতি।

এরপরে শুরু হবে বরের আশীর্বাদী সভা। বর ধুতি-জামা পরে হাতে শালপাতা দিয়ে তৈরি একটি থালার উপরে এক ঘটি জল বসিয়ে নিয়ে উপবিষ্ট সকলের সামনে রেখে আবার সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন জানাবে। উপবিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান এগিয়ে এসে ছেলেকে নিজের উরুর উপরে বসাবে। একটা মার্কিন কাপড় তার মাথায় বেঁধে দেবে। বর উরুতে বসার আগে এক পাত্র মদ ঐ ব্যক্তিকে দেবে এবং উঠে আসবার পরে আবার একপাত্র মদ ঐ ব্যক্তিকে দেবে। একইভাবে উপস্থিত আশীর্বাদকরা কাজ করবে এবং বরও অনুরূপ ব্যবহার করবে। তবে উপস্থিত সকলে কাপড় দিতে পারে না, তাই তারা আশীর্বাদের সময় হাতে একটি টাকা দেয়। আবার যারা টাকার থেকেও কম দেবে তারা তাদের দেয় অর্থ ঘটির জলের মধ্যে ফেলে দেবে। বর প্রত্যেককেই "ডব" বা "জোহার" করবে এবং বসতে-উঠতে একপাত্র করে মদ দেবে।

এই অনুষ্ঠান শেষ হতে হতেই রাতের খাবার সময় হয়ে যায়।

কন্যাপক্ষকে পাঁঠার বা খাসির মাংস দিয়ে ভাত খাওয়ানোই নিয়ম। খাওয়া শেষে আবার মদ। এরপর বিশ্রাম।

পরের দিন সকালেই আবার মদ দিয়ে আপ্যায়ন শুরু। কন্যাপক্ষের দলকে দু'বার ভাত খাওয়ানো নিয়ম। কাজেই আগের দিন যদি একবারই ভাত খাওয়ানো হয়ে থাকে তাহলে পরের দিন দুপুরে তাদের ভাত খাইয়ে, মদ খাইয়ে তবে রওয়ানা করাবে। রওয়ানা করানোর আগে অতিথিদের সকলের পায়ে ও মাথায় সরিষার তেল ও হলুদ মাখিয়ে দেবে। এর পর বর-কনেকে নিয়ে কন্যাপক্ষের সকলে নিজেদের গ্রাম অভিমুখে যাত্রা শুরু করবে। এই দলের সঙ্গে ঘটকি বা ঘটক অবশ্যই থাকবে।

নিয়ম অনুযায়ী বর-কনে এবারে তিন দিন মেয়ের বাড়ি থাকবে। তিন দিন পরে ঐ ঘটকের সঙ্গে বর-কনে ঘরে ফিরে যাবে। পাঁচ-সাত দিন পরে মেয়ের দাদা বৌদি যাবে আনতে, মেয়ে ওদের সঙ্গে চলে আসবে বাপের বাড়ি। এবারে সাত আট দিন মায়ের কাছে মেয়ে থাকবে। এই সময়ে নিয়ম-অনুযায়ী জামাই বৌকে নিতে আসবে। এবারে মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে স্বামীর ঘর করতে চলে যাবে। এর পর থেকে যাওয়া-আসা নির্ভর করবে প্রয়োজন এবং পরিবারের কর্তার অনুমতি সাপেক্ষে।

এই হল সংক্ষেপে পুরোনো প্রথায় বিবাহ-ব্যবস্থা। এর সাঁওতালি নাম বাপ্‌লা, বা কিরিং-বহুবাপ্‌লা। আজও এই প্রথা মর্যাদায় অদ্বিতীয়। যে মেয়ের এই প্রথায় বিয়ে হয়েছে সে আত্মগর্বে গরবিনী।[১]

এই বিয়ের অর্থনৈতিক দিক—

সাঁওতালদের এই বিবাহ-পদ্ধতি ঐতিহ্যগত। আজকাল এইরূপভাবে বিয়ে হওয়াটা প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। বলা যায় এইভাবে ছেলেদের বিয়ে দেওয়াটা বড়োলোকি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কতটা ব্যয়সাপেক্ষ তার একটু আঁচ নীচে দিলাম।

প্রথমেই ধরা যাক খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা। উভয়পক্ষের প্রচুর লোক সমাগম হয়, তাদের সকলকে খাওয়াতে হলে, শুধু বরযাত্রী এবং কন্যার পক্ষের আত্মীয়-স্বজনই হবে শতাধিক। তার উপর আছে যে যার

১. এই পদ্ধতিতে বিয়ে হলে মেয়ের মনে যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে বর্তমান লেখক প্রণীত 'আলেখ্য' পুস্তকের 'শুর্নী' চরিত্রে।

গ্রামের লোক। তাদের অন্তত একটি ভোজ দিতেই হবে। এই ভোজ দিতে হলে একটি পাঁঠা বা খাসি লাগবেই। মদের অঢেল ব্যবস্থা রাখতে হয়। সে খরচও কম নয়। তারপর আছে ধুতি, শাড়ি মার্কিন ইত্যাদি বস্ত্র। একপক্ষে শাড়ি লাগবে কমপক্ষে সাতখানি, ধুতি দু'খানি, মার্কিন পনের-ষোল গজ। আর একটি মোটা খরচ বাজনদারদের জন্য। এই দলে চার-পাঁচ জন লোক থাকবে। এদের উপস্থিতি অপরিহার্য। এদের দিতে হবে একখানা পাঁচ হাত মার্কিন, দুই থেকে তিন শলি চাল, একটা পাঁঠা বা শুয়োর, নগদ চল্লিশটা টাকা। এগুলি বাজনদার বাড়ি নিয়ে যাবে। এছাড়া তার চার পাঁচ জনের দলটির চারদিন খোরাকি দিতে হবে। হিসাব : মাথাপিছু এক সের চাল ; দু'বেলায় দুসের অর্থাৎ দিনে আট দশ সের চাল। রোজ দুটি করে মুরগি এবং দু'বেলায় দুই কলসি করে হাঁড়িয়া প্রতিদিন। কনের বাড়ি বাজনদার থাকবে দু'দিন থেকে তিনদিন। সেই অনুপাতে খরচটি কিছু কমবে অবশ্য। এছাডাও নিকটস্থ ভাটিখানার মালিককে ছেলের বিয়েতে দিতে হবে একটি পাঁঠা, এবং মেয়ের বিয়েতে একটি মুরগি, যেহেতু সে আবগারী বিভাগের কাছে সাঁওতালদের বিয়ের জন্য ঘরে-ঘরে হাঁড়িয়া তৈরি করার জন্য ছাড়পত্র পেতে সুপারিশ করে। সাঁওতালরা এই বিশ্বাসেই শুঁড়িখানার মালিককে এই নজরানা দিয়ে আসছে।

ওদের জিজ্ঞাসা করে যা উত্তর পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে খুব টেনে-টুনে খরচ করলেও লেগে যায় হাজার খানেক টাকা।[২] বছর খানেক আগে একজন সম্পন্ন গৃহস্থের ছেলের বিয়েতে খরচ করেছে প্রায় চার হাজার টাকা। কাজেই বিবাহ যখন অবশ্যঘটনীয় এবং সাঁওতালরা যখন প্রায় সবাই ভূমিহীন চাষী বা গরীব দিনমজুর, তখন বিবাহের বিকল্প ব্যবস্থাগুলিই যে দিন-দিন বহু প্রচলিত হবে তাতে আর সন্দেহ কি ?

এই বিকল্প ব্যবস্থাগুলির কথাই এবারে বলব।

১, এক শলিতে কুড়ি সের।

২, ১৯৬১ সালের হিসাব অনুযায়ী

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবাহ-প্রথা ও সমাজ-ব্যবস্থায় পরিবর্তন

সাঁওতালি বিবাহ : সাঙা ও অন্যান্য পদ্ধতি

আগেই বলেছি যে, 'বাপ্‌লা' বা traditional বিয়ে দিন দিন কমে যাচ্ছে, তার কারণ শুধু অর্থনৈতিকই নয়। আমার এই মন্তব্য হয়তো সকলের মনঃপুত হবে না ; তাঁদের মনে হতে পারে এটা আমার ধারণা মাত্র। সেজন্য এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। সমাজের বাইরে গিয়ে বিয়ের জন্য খরচ করাটা বাবুলোকদেরই একচেটিয়া নয়। সাঁওতালরাও এমনটি করে থাকে। তেমনি কেতাদুরস্ত বিয়ে দেবার আর্থিক সঙ্গতি আছে, সে বাড়ির ছেলেকেও দেখা গেছে কেতাবী পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ ধরতে। এই ভিন্ন পথটাও সমাজ-অনুশাসনের অন্তর্গত একটা পথ। সেইটাই আগে বলছি।

শ্যাম একটি নামকরা সাঁওতাল পরিবারের ছেলে, পিতার একমাত্র সন্তান। মাতা-পিতা উভয়েই বর্তমান। তার বয়স তখন সবে এক-কুড়ি পেরিয়েছে। ভালো বাঁশি বাজায়। ছুকরি মেয়েদের প্রতি নজর পড়েছে। তার মা সে কথা জানে। স্বামীকে সে জানিয়েছে। কিছুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে একটি ছুড়িকে নিয়ে গ্রামের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। তার মায়ের, কাকিমার এবং আরও দু'চার জনার নজরে পড়েছে। এর পরই একদিন মেয়েটাকে সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এনে তুলল নিজেদের ঘরে। মা দেখল। কি আর করবে, ঘেরা বারান্দায় তাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়ে গেল। পরের দিন ভোরেই ওরা দুজনে বাড়িতে নেই। দুপুর থেকে আবার শ্যামকে যথারীতি গোরু ছাগলের রাখালি করতে দেখা গেল। ভাবটা যেন কিছুই হয়নি। আবার কিছুদিন চুপচাপ গেল। মাস দুই পরে আবার ঐরূপ ঘটনা ঘটল তাদের অদূর গ্রামের অন্য একটি মেয়েকে নিয়ে। দ্বিতীয় মেয়েটি নাকি দু'তিন দিন ছিল। তার কারণ শ্যামের মার এই মেয়েটিকে পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু সে মেয়েও শ্যামের মায়ের ঘরে উঠল না। এসব খবর শ্যামের মার কাছ থেকেই পাওয়া। সেই-ই ঐ সূত্রে একদিন বলল, 'মেয়েটা ভালো নয় বাবু, আমি আগে বুঝতে পারিনি।'

এরপর আর কথা নেই। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, এরা যদি কোনো কথা লুকোতে চায়, আপনি তা বুঝতে পারলেও ওদের দিয়ে কবুল করাতে পারবেন না। কাজেই এরূপ অবস্থায় পরিস্থিতি বা প্রসঙ্গ-পরিবর্তনের সুযোগের অপেক্ষায় থাকাটাই প্রকৃষ্ট পথ।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৫৭ সালে। ঐভাবে শ্যামের বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি। দ্বিতীয় মেয়েটির পরে যখন তৃতীয় বার একটি মেয়েকে ধরার ফিকিরে সে ঘুরছে তখন তার খুব দুর্নাম হয়ে গেছে সেটা সে তো বুঝলই, তার অভিভাবকদের কাছেও সে খবর পৌঁছতে দেরি হয়নি। এই অবস্থায় শ্যামের বাবা ঘটক লাগিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের গ্রাম থেকে অনেক দূরের গ্রামে কেতাদুরস্ত পদ্ধতিতে ঢোল কাঁসর বাজিয়ে ছেলের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল। নিশ্চিন্ত তো হল, কিন্তু এই বিয়েতে শ্যামের বাবার বেশ কিছু দেনা হয়ে গিয়েছিল। সে কথা জানতে পারি যখন কোমরে গামছা বেঁধে বন্দী করে একদিন এক কাবুলিওয়ালা শ্যামের বাবাকে নিয়ে এল আমার আঙিনায়। তাড়াতাড়ি ছেলেকে পাত্রস্থ করতে গিয়ে বেশ কিছু অর্থদণ্ড তাকে দিতে হয়েছিল বৈকি!

এই পরিবারেরই অন্য একটি ছেলের কথা এবারে বলি। এটা ঘটেছিল ১৯৭২ সালে। সে শ্যামের সম্পর্কিত ভাই। ধরা যাক, এর নাম রাম। রামের বয়স তখন কুড়ি বাইশ বছর হবে। সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে। লেখাপড়া কিছুটা শিখেছে, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। রামের বাবাকে বলি, "কিরে, ছেলের বিয়ে দিবি না?" সে বলে, পড়ছে যখন পড়ুক না। ইচ্ছে হল রামের মায়ের মনের কথাটা জানতে। জিজ্ঞাসা করলাম একদিন, "কিরে রামের বিয়ে দিবি না?" মেঝেন ঢোক গিলল— মনের কথাটা যেন গিলে ফেলল। প্রশ্নের উত্তর দিল না, কিন্তু মুখটি ভার করল, ব্যাপার কি?

সংক্ষেপে বলে, "বিয়ে তো দিতাম, গত বছর ভালো ধান হল না তো, আর ঘরটা সারানো হল না, তাই ভাবলাম পরের বছর দেব।" আর কিছু বলে না মেঝেন। একটু উস্কে দেবার জন্য বললাম, "তা এবছর দিচ্ছিস্‌নে কেন? তাছাড়া ছেলের তো চাকরি হয়েছে।"

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি। ছেলেটি লেখাপড়া শিখেছে, সেজন্য অর্থকরী হাতের কাজ— যেমন কাঠের বা তাঁতের কাজ শেখানোর প্রস্তাব

করেছিলাম আমি। কিন্তু ওর বাবা ভালো চাষী, দেখলাম তার নজর চাষের দিকে। তবে পরের ক্ষেতে দিনমজুর হবার রামের ইচ্ছা নেই; সেইজন্যই পড়াটা নামমাত্র চালাচ্ছিল। তাকে চাষ-ই করতে হবে—কিন্তু যেন মাসকাবারি মাইনের কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ পেলেই সে খুশি। মায়ে-বেটায় সুলুক-সন্ধান করে কিছুদিনের মধ্যে জোগাড় করে ফেলল একটা মনোমত কাজ।

রামের মা-বাবা খোঁজ রাখে ছেলের কোনো মেয়ের প্রতি ঝোঁক আছে কি না। ইচ্ছেটা যদি তেমন কিছু জানতে পারে তাহলে সেই মেয়েকে বৌ করে ঘরে আনার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যে আমার নজরে পড়েছে রাম জনৈকার সঙ্গে অবরে-সবরে ঘুরছে। ভিন্ গাঁয়ের মেয়ে। ভাবলাম কেউ কুটুম এসেছে হয়তো। হঠাৎ একদিন সিনেমা পাড়ায় আরো দু'জন বন্ধুর সঙ্গে রামকে দেখলাম, তাদের সঙ্গে ঐ মেয়ে। একটু খটকা লাগল। আমি যে দেখেছি সেটা জানান দেবার জন্য রামকে কাছে ডাকলাম, দু'চার কথা বললাম। সে সলজ্জভাবে কথার উত্তর দিল। মেয়েটাকেও একটু দেখে রাখলাম, বললাম না কিছু।

রামের মাকে খবর দিয়ে বাড়ি ফিরলাম! বললাম, "একবার আসিস কথা আছে।" পরের দিন সে এল। অল্প কথায় সারি। রামের মা দেখেছে ওদের কাণ্ড। ছেলেকে বলেছে, ও মেয়ে তার পছন্দ নয়। মেয়ে কালো, মুখশ্রী ভালো নয়; ছেলের চেয়ে বয়সে দু'চার বছরের বড়োই হবে। ওই মেয়ের খপ্পর থেকে ছেলেকে উদ্ধার করার চেষ্টা রামের মা করছে, রামের বাবা কিছু বলেনি কিন্তু। ইতিমধ্যে ছেলে ভাবী শ্বশুরবাড়ি কাটিয়ে এসেছে। ছেলে দোকানে বসিয়ে বন্ধুবান্ধবদের বৌ-খাবার (আমার ভাষায়) খাইয়েছে। অর্থাৎ কি না ওদিকে যা হবার হয়ে গেছে; মা-বাবার অমতেই এই কাণ্ড ছেলে করেছে। বললাম; "এখন তোরা কি করবি ঠিক করেছিস?"

ওর বাবা তো কিছু বলছে না।—

আর বিবরণ দিয়ে লাভ নেই। মোদ্দা কথা সেই ছেলে বৌ নিয়ে তার গাঁয়েই মা-বাবার ঘরে উঠল, কোনো অনুষ্ঠান ছাড়াই। এ বিয়ে সমাজ-সিদ্ধ। একে ওদের ভাষায় অনেক জায়গায় বলে 'রাজা-রাজি'। রামের সন্তান হতে বেশিদিন দেরি হয়নি। বছরের মধ্যেই রামের মা

নাত্‌নীর মুখ দেখেছে। বৌকে সম্ভবা বুঝতে পেরেই তাড়াতাড়ি তাকে সসম্মানে ঘরে তোলার ব্যবস্থা করেছে।

উপরোক্ত ঘটনাকে সম্পূর্ণ করতে হলে আর একটি বিয়ের কথা এখানেই বলতে হবে। সেটা ঘটেছে রামের বড়ো ভাই বুধনের বেলায়। বুধন ছোটো থেকেই মামার বাড়িতে মানুষ। মাঝে মাঝে মা-বাবার কাছে আসতো। বুধন যখন বেশ জোয়ান হয়ে উঠেছে, বয়স বাইশ-তেইশ বছর হবে তখন মা-বাবার কাছে একটি চাষের মরশুম পুরো রইল, পুরো-দস্তুর চাষবাস করল। তার মা-বাবার ইচ্ছা এইবার ছেলেটার বিয়ে দেয়। কিন্তু ওদের আশা প্রথম সন্তান একটু ঘটা করে বিয়ে দেবে। অর্থাৎ ঢাক ঢোল বাজিয়ে 'বাপ্‌লা' বিয়ে দেবে। কিন্তু পর পর দু'সাল চলে গেল সে অর্থের সংস্থান হল না। ছেলে আবার মামার বাড়ি চলে গেল। কিছুদিন পরে জানা গেল সে ভাবী শ্বশুরবাড়িতে এখন থাকছে, চাষবাস করছে। অর্থাৎ কিনা যে বাড়ির মেয়ের সঙ্গে বুধনের বিয়ে হবে সেই বাড়িতে পাঁচ বছর বিনা পারিশ্রমিকে বুধন কাজ করে দেবে। অর্থাৎ বুধন বাকদত্ত হয়ে ঐ বাড়িতে ঢুকল। ইতিমধ্যে তারা স্বামী-স্ত্রী হয়েই বাস করবে। যাবতীয় খরচের হাত থেকে বুধন মুক্ত। পাঁচ বছর পরে চাষের উপযুক্ত হাল গোরু এবং কিছু ধান নিয়ে আবার বুধন ফিরে যাবে। এই ভাবেই বুধনের বিয়ে হয়েছে, মা-বাবার মত না নিয়েই সে নিজের চেষ্টায় বিয়ে করেছে। অবশ্য বুধনের শ্বশুর, জামাইয়ের উপর খুবই খুশি ছিল। তাই জামাইকে তিন বছরেই মুক্তি দিয়েছে। বুধন শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে মামার গাঁয়ে গিয়ে তাদের সাহচর্যে ঘর বেঁধে সেখানেই চাষ করছে। এরূপ বিয়ে ওদের সমাজে চল্‌ আছে। একে ওদের ভাষায় বলে 'ঘর-দে-জঁাওয়ঁার', বলা যায় 'সাময়িক ঘরজামাই'।

রামের মা-বাবা বড়ো ছেলে বুধনের বেলায় খানিকটা শিক্ষা পেয়েছে, তাই রামের বেলায় অপছন্দ থাকলেও তাই নিয়ে বেশি টানা-পোড়েন করেনি। তবে দুই ছেলের বিয়ের কোনোটাই যে তাদের মনঃপূত হয় নি তা বলাই বাহুল্য। এইসব বিয়ে সমাজে স্বীকৃত হলেও সম্মানের দিক থেকে কমতি বলে বংশের মর্যাদা হানিকর বলেই মনে করা হয়ে থাকে, আজও।

এই প্রসঙ্গে এখানে বলে রাখি, পুরোদস্তুর ঘরজামাই রীতিও এদের

মধ্যে চলিত আছে। কিন্তু ঘরজামাই হওয়াটা ছেলের দিক থেকে কিছুটা অসম্মানকর। তেমনি মেয়ের দিক থেকে বেশি সম্মানের। তাই একটি পছন্দসই ছেলে পেলে জমিজেরাতওয়ালা মাঝি তাকে জামাই করে ঘরে আনবার জন্য খুব চেষ্টায় থাকে। এরূপ মাঝি যদি অপুত্রক হয় তাহলে সর্বতোভাবে চেষ্টা করে যায় জামাইরূপী একটি পুত্র লাভ করার জন্য। এই বিষয়ে তার পরিবারে মেয়ের মা এবং মেয়ে স্বয়ং কারো দ্বিমত থাকে না। এক্ষেত্রে বিয়েটার পুরোপুরিভাবে দায়দায়িত্ব বর্তায় কন্যার পিতার উপর। এই অঞ্চলে আমি এমন সাঁওতাল-গ্রাম দেখি নি যেখানে দু-একটি ঘরজামাই নেই।

'বাপ্‌লা' বিয়ের বেলায় ঘটকদার যে কাজ করেছে এই বিয়ের বেলাতেও ঘটকদার অনুরূপভাবে কাজ করে। সেই প্রারম্ভিক কথাবার্তা চালায় ; পরে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ নিজেরা একসঙ্গে বসে দিন ঠিক করে। এই সময়েই দেনা-পাওনা ইত্যাদির কথা সব হয়ে যায়। এই বিয়ে অবশ্যই কুমারী ও আইবুড়ো ছেলের মধ্যে বিয়ে। তবে এর অনুষ্ঠানাদির ঘটা নেই এবং এতে খরচও কম।

এই বিয়েতে ঘর থেকে বাজনদারের দল নিয়ে কন্যাপক্ষ সদলবলে ছেলের বাড়ি যাবে। সেখানে পৌঁছে মদের আসর বসবে। উভয়পক্ষের লোকেদের মদ খাওয়া শেষ হলে ছেলেকে নিয়ে কন্যাপক্ষ নিজ গ্রামের দিকে রওনা হবে। সঙ্গে ছেলের ঘর থেকে কাকা, দাদা, ভগিনীপতি (যেমন 'কিরিং-বহু' বাপ্‌লাতে) এই রকমের পুরুষরা বরযাত্রী হিসাবে যাবে। সেই সঙ্গে 'লম্‌তা' বা নীত্‌বরও যাবে। মেয়ের বাড়ি পৌঁছে একপ্রস্থ মদ খেয়ে নিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা শুরু হবে। সংক্ষেপে বললেই চলবে বিয়ের ব্যাপারটা বাপ্‌লাতে যেরূপ হয়েছে, মেয়ের বাড়ি ঠিক ঠিক সেইরূপও কন্যাপক্ষ করতে পারে। তবে যদি তারা অতো ঘটা না করতে চায় সংক্ষেপে অল্প খরচেও সারতে পারে। এতে সামাজিক কোনো বাধা নেই। মোট কথা সমাজকে যদি খাইয়ে-দাইয়ে কোনো পক্ষ খুশি করতে পারে তাহলে কোনো দীর্ঘ অনুষ্ঠানকে সংক্ষিপ্ত করাটা কোনো সমস্যাই নয়। আমি এমনও দেখেছি মেয়ের ঘরে ছেলেটাকে নিয়ে এসে রেখে দিয়েছে, কয়েকদিন পর একদিন তাদের বিয়ে হয়ে গেছে, এই খবরটাই পেলাম ; যদিও প্রত্যহ সেই গ্রামে আমার যাতায়াত। এক্ষেত্রে অনুষ্ঠানটা কি ?

না বরপক্ষকে একদিন আসতে বলা হয়েছিল, তারা কয়েকজন এসেছিল। সেই দিন দুই দলে বসে কিছু খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল। বাস্। সিঁদুর ইত্যাদি দেওয়া, সে মেয়ের মা মাসিমা ছেলেকে হুকুম দিয়ে যা না করলে নয় সেটুকু করিয়ে নিয়েছে, নেহাতই নিজেদের ঘরোয়া গণ্ডির মধ্যে।

সাঁওতালদের মধ্যে বিধবা বিয়ের চল বহুদিন থেকে। যার স্বামী মারা গেছে তাকে এরা বলে 'রণ্ডি'। এই অর্থে বিধবা বিয়েকে 'রণ্ডি-বিয়ে' বলাই সমীচীন। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার জন্য যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় তাকে এরা বলে 'ছাড়ুই'। এই ছাড়ুই স্ত্রী বা স্বামী উভয়েই আবার স্বামী বা স্ত্রী গ্রহণ করে থাকে। এই বিয়ের প্রকরণ খুবই সংক্ষিপ্ত। সে কথা বলার আগে ছাড়ুই হবার করণগুলি (আমার নজরে যতদূর এসেছে) আগে জানিয়ে দিই। সমাজ-বিজ্ঞানের দিক থেকে এগুলির মূল্য অনেক।

কেন ছাড়ুই হল? জিজ্ঞাসা করলে এক কথায় ওরা উত্তর দেবে:

কেন? ওর সঙ্গে ওর হল না, তাই। মানে দুজনার মধ্যে বনিবনা হল না। না হবার কারণ একাধিক থাকতে পারে। যেমন ১. দুজনার মধ্যে প্রায়ই খিটিমিটি ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকে। তারপর মারধোরও হতে দেখা যায়। এই কারণে স্বামীর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে প্রায়ই স্ত্রী মার ঘরে চলে যায় বটে কিন্তু মা-বাবার চেষ্টায় আবার ভাঙা মনও জোড়া খায়। মার খেয়েও সুখে-দুঃখে ঘর-সংসার করছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল হলেও অসম্ভব নয়। ২. দেখা যায় স্বামী যদি নেশা করে বাড়ি ফিরে প্রায়ই স্ত্রীকে মারধোর করে এবং সেরূপ স্ত্রীর যদি সেই সংসারে অন্য বিশেষ কোনো বন্ধন না থাকে বা স্বামীর সংসারে মায়া-মমতা এবং সহৃদয়তা দেখাবার কেউ না থাকে; পরন্তু এরূপ স্ত্রীর বাপের বাড়ি থাকে, বিশেষ করে তার মায়ের দিক থেকে ফিরে আসার জন্য উস্কানি থেকে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে 'ছাড়ুই' অবশ্যম্ভাবী। ৩. আর একটি কারণে প্রায়ই 'ছাড়ুই' ঘটতে দেখা যায়। তা হল: স্বামী যদি স্ত্রীকে অচ্ছেদ্দা করে, কষ্ট দেয় এবং সেই সঙ্গে অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি দেখায় সে ক্ষেত্রে ছাড়ুই হতে কোনো বাধা নেই। এরূপ পুরুষকে সংশোধন করার জন্য অনেক সময় সমাজকেও যুক্তভাবে ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়। যদি ঐ ব্যক্তি সে নির্দেশ না শোনে তাহলে পঞ্চায়েতের তরফ থেকে ঐরূপ স্বামীর উপর জরিমানা

ধার্য করা হয় ; কিন্তু কার্যত দেখা যায় এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীটি পঞ্চায়েতের রায় শোনার অপেক্ষায় না থেকে সোজা বাপ-মায়ের বা ভাইয়ের ঘরে চলে যায়। সেখানে কোনো অনুষ্ঠান বা নিয়মকানুন পালন না করেই আইবুড়ো মেয়ের মতো জীবন যাপন করতে থাকে এবং পরে নতুন স্বামী নির্বাচন করে আবার সংসারী হয়।

এদের বিবাহ বিচ্ছেদটা শুধু যে পুরুষের দোষেই ঘটে তা নয়। ৪. স্ত্রীর দোষেও স্বামী স্ত্রীকে বর্জন করে খুব সাধারণ কারণে যা দেখা যায় তা হচ্ছে স্ত্রীর পর-পুরুষের প্রতি আসক্তি। যতদিন না সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় ততদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি চলতেই থাকে। আস্তে আস্তে গুজব, কানাঘুষো ইত্যাদিতে ঐরূপ স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাস বাড়তে থাকলেও সমাজ তার উপর কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা সাধারণত নেয় না। কিন্তু যখনই কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল তখন সমাজ অবস্থার গুরুত্ব বুঝে জরিমানা থেকে শুরু করে ত্যাগ করার নির্দেশ পর্যন্ত দিয়ে থাকে। এইরূপ অবস্থায় স্ত্রীর পক্ষে মায়ের ঘরে অসম্মানের কালি মেখে ফিরে আসা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তখন মা-বাবা বা দাদাকে তাদের সমাজের কাছে অর্থদণ্ড এবং সদ্ব্যবহারের মোচলেকা দিয়ে তাদের মেয়েকে ঘরে তুলতে হয়। তবে এইসব ক্ষেত্রে দেখা যায় মেয়ের এবং তার অভিভাবকেরা অপরাধ অস্বীকার করে এবং শেষ পর্যন্ত সমাজও নিশ্চুপ থেকে যায়। মনে হয় এক্ষেত্রে সমাজও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে এই ভেবে যে তাদের গ্রামের মেয়ের উপর অন্যায় করে দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরূপ মেয়েরও সময়কালে আবার সঙ্গী জোটে, ঘর-সংসার পেতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে আছে এমনও দেখেছি এই অঞ্চলে। আবার অত্যন্ত করুণ পরিণতিও হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এই সঙ্গে আরো একটু বলে রাখা দরকার। প্রমাণ অভাবে সমাজ কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নারীর প্রতি না নিলেও যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবিশ্বাসের কাঁটা সর্বদাই খচ্‌খচ্‌ করতে থাকে, তখন স্ত্রী-ই রণে ভঙ্গ দিয়ে পিত্রালয়ে গমন করে তার দুর্ভাগ্যকে মেনে নেয়।[১]

আরো একটি কারণ এই অঞ্চলে আমি খোঁজ পেয়েছি। সেটা হচ্ছে

১. লেখক প্রণীত 'আলেখ্য' পুস্তকে বর্ণিত গোলাপ চরিত্র দ্রষ্টব্য।

৫. বিয়ের পর তা যে পদ্ধতিতেই বিয়ে হোক না কেন, যদি কোনো মেয়ে সন্তানসম্ভবা না হয় তাহলে সেই স্ত্রীকে ত্যাগ করার বিধান এদের সমাজেও আছে। অবশ্য ত্যাগ করার আগে প্রতিকারের চেষ্টা মেয়ের মায়ের বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়ি থেকে যথেষ্টই করে থাকে। সাধারণত পুরুষের দোষ আছে কি না তা খোঁজ করে দেখার চেষ্টা একটি মাত্র ক্ষেত্র ছাড়া দেখি নি। চেষ্টার ফলে যদি কোনো ফল না হয় তখন স্বামী ইচ্ছা করলে বিধিসঙ্গতভাবেই স্ত্রীকে বর্জন ক'রে নতুন স্ত্রী গ্রহণ করে থাকে। আবার এমনো দেখেছি একটিমাত্র ক্ষেত্রে হলেও সর্বপ্রকারের চিকিৎসা করার পরেও যখন জানা গেছে যে পুরুষটির পুরুষত্ব সম্যক বর্তমান এবং ঐ মেয়ের বন্ধ্যাত্ব ঘোচবার নয়, তা সত্ত্বেও স্বামী ভিন্ন স্ত্রী গ্রহণ করে নি। আজও তারা সংসার করছে। তারা ইদানীং একজন আত্মীয়-পুত্রকে সন্তানের মতো বাড়িতে রেখেছে।

সাঁওতালরা একজন পুরুষ একটি স্ত্রীকে নিয়ে ঘরসংসার করে, —এইটিই নিয়ম। কিন্তু এক স্ত্রী বর্তমানে অন্য একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছাড়াও তাকে সংসারে এনে দ্বিতীয়া স্ত্রী হিসাবে রাখার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। কোনো স্ত্রী চায় না (ব্যতিক্রম আছে) তার স্বামীর উপর অন্য কোনো স্ত্রীলোক ভাগ বসায়; কিন্তু তার চাওয়া না চাওয়ার তোয়াক্কা না করে যদি স্বামী অন্য আর একজনকে ঘরে এনে তোলে তখন এক কথায় প্রথমার পক্ষে স্বামীগৃহ ত্যাগ করা সম্ভব হয় না; হয়তো সে তখন পুত্র-কন্যা, গোরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি নিয়ে মন-প্রাণ ভরে সংসার করে চলেছে। এই অবস্থায় এই বজ্রাঘাতে অভিভূত সে অবশ্যই হয় কিন্তু নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টাও কেউ-কেউ করে। বেশিদিন এইভাবে চলে না। শেষ পর্যন্ত প্রথমাকে বিদায় নিতেই দেখা যায়। একবার স্বামীগৃহ-ত্যাগী জনৈকাকে জিজ্ঞাসা করলাম: বেশ তো সতীনের সঙ্গে ঘর করছিলি, তবে আবার পালিয়ে এলি কেন? তার উত্তর: ওরা দুজনে ঘরে রোজ রোজ শোবে, আর আমি সিঁড়িতে (বারান্দায়) পড়ে থাকব? কতদিন এমনি করে থাকা যায় বল?

এরূপ স্ত্রী যদি 'বাপ্‌লা' বিয়ের বৌ হয় তাহলে সে মায়ের ঘরে যাবার সময় নিয়ম অনুযায়ী একটা বলদ ও কিছু টাকা পায়। আর সে যদি সাঙা-করা-বৌ হয় তাহলে তাকে শুধু নিজের পরনের কাপড়-জামা

নিয়েই বিদায় নিতে হয়। সব সময় যে প্রথমার ক্ষেত্রেই এইরূপ দুর্ভোগ হয় তা নয়। উল্টোটাও হতে দেখেছি। কিছুদিন নতুন সঙ্গীকে ভোগ করার পর স্বামী আবার পলায়িতা প্রথমার দ্বারস্থ হয়েছে এবং দ্বিতীয়া অবস্থা বুঝে নিজের পথ দেখেছে।

একটু আগে নিয়মের ব্যতিক্রমের কথা বলেছি। সে সম্বন্ধে এখানে একটু বলে রাখি। ব্যতিক্রমের ঘটনাটা বড়ো নয়, কিন্তু এর তাৎপর্যটা বেশ উৎসাহব্যঞ্জক।

স্বামী-স্ত্রীর সুখের সংসার। এই সংসার সংগঠনে স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর অবদানই বেশি। নিজস্ব জমি-জেরাত নিয়ে ভরাট সংসার, অভাব অনটন নেই। নেই তাদের সন্তানাদিও। এজন্য তাদের মনে অভাববোধ অবশ্যই ছিল। এই অভাব পূরণের জন্য স্ত্রী তার ভাইপোকে ছোটো থেকেই পালন করেছে। মাঝির বয়স তখন তিনের কোঠা পেরিয়ে চারের কোঠায় ঢুকে পড়েছে ; তার মেঝেনও চারের কোঠা ছুঁই ছুঁই করছে। দুজনেরই চেহারা গড়ন-পেটন নজরে পড়ার মতো। সেই মাঝিকে দেখা গেল তিন কন্যার জননী এক বিধবার বাড়ি যাতায়াত করতে। যাতায়াত কচিৎ-কখনো থেকে নিয়মিত হল তা চোখের উপরই দেখলাম। উঠোনের আড্ডা থেকে ঘরের ভিতর এবং সন্ধ্যা থেকে যখন রাত্রেও পানাহার শুরু হল তখন আর কারো জানতে বাকি রইল না ওদের ভবিষ্যৎ। ওদিকে বাড়িতে বাপলা-বিয়ের বৌ ; বাড়িটা বৌ-এর পৈত্রিক সম্পত্তি। পুরোনো বৌয়ের গঞ্জনার মাত্রা যখন অসহ্য হল তখন পুরোনো বাড়িতে যাওয়াই বন্ধ করে দিল মাঝি। অথচ মাঝি জন-মজুর খেটে পেটের ভাত জোগাড় করতে অভ্যস্থ ছিল না। তাতে তার কোনো অসুবিধা তেমন হল না। নতুন বৌ (রক্ষিতা) ও তার প্রায় সাবালিকা কন্যা দুজনের রোজগারে সংসারে সুখের কমতি ছিল না। এইভাবে নতুন সংসারে সে আস্তানা নিল। এইভাবে কয়েক বছর কাটাবার পর যে প্রথমা, দ্বিতীয়ার মুখদর্শন করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সেই-ই স্বামীর ঔরসজাত পুত্রটিকে বাড়িতে এনে মাঝে মাঝে রাখতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সৎ-সতীন ছেলে-মেয়ে নিয়ে নিজ বাড়িতে দিব্যি জমজমাট সংসার গড়ে তুলল। আজও বড়কির বাড়িতে ছুটকি দিব্যি ঘর করে চলেছে।

এই যে বিয়ে এদেরকে কোনো কেতাবী নামের মধ্যে ফেলা যায় না।

দিন দিন এই ধরনের বিধি-বহির্ভূত বিয়ের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এতে খরচা নেই, আনন্দ আছে; দায়িত্ব নেই, মজা আছে; তবে ঝুঁকি অবশ্য খানিকটা থাকেই। এই ঝুঁকিটুকু যে নারী পুরুষ একজোট হয়ে নিতে পারে তাদের কাছে সরব সমাজও স্তব্ধ হয়ে যায় দু'চার ঘোলা হাঁড়িয়ার মৌতাতের যাদুতে।

সামাজিক পথে না গিয়ে সামাজিক নিয়ম কানুন-মেনে নিয়ে বৌ বদলানো যায়, তবুও কেন যে ওরা এমন, সে কথা পরে বলছি। কানুন মেনে বৌ বদলানোর কথা বলতে যেটুকু বাকি আছে এখন সেটা বলে নিই।

বিধবাকে সাঁওতালিতে বলে 'রণ্ডি'। যার একবার বিয়ে হয়েছিল, বর্তমানে আগের স্বামীর সঙ্গে পূর্ব-সম্পর্ক নেই এমন মেয়েকে ওরা বলবে 'ছাড়ুই'। এই ছাড়ুই মেয়ে এবং বিধবা উভয়েই আবার নতুন পুরুষ নির্বাচন করে সংসার পাততে পারে। বিধবা যে পুরুষকে নিয়ে সংসার পাতলো তাকে বলা হয় 'রণ্ডি' বিয়ে। আর সাঙা হচ্ছে বিবাহ-বিচ্ছেদের পথ দিয়ে যে মেয়ে বা পুরুষ একক বাস করছে এরূপ স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে অন্য অনুরূপ পুরুষ-স্ত্রীর মিলন। তাছাড়া এখানে পুরুষের প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব আছে। কোনো মৃতদারের সঙ্গে যদি কোনো 'ছাড়ুই' মেয়ের মিলন হয় তাহলে তাকে 'সাঙা'-ই বলা হয়; যদিও উল্টোটাকে বলা হচ্ছে 'রণ্ডি' বিয়ে। সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে 'সাঙা'-র তুলনায় 'রণ্ডি'-বিয়ে নিম্ন মানের।

বিবাহ-বিচ্ছেদের কতকগুলো সামাজিক নিয়ম আছে, তার কিছুটা একটু আগে বলেছি। এখানেও প্রসঙ্গক্রমে আরও কিছুটা বলব। যদি কোনো পক্ষ, যেমন কোনো স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে পুরুষটির স্ত্রী বা তার নিকট আত্মীয়ের কেউ, পুরুষটির বিরুদ্ধে ওদের গ্রামীন পঞ্চায়েতের কাছে নালিশ করে, তখন পঞ্চায়েত বিচার-সভা ডাকে। সেই বিচার-সভায় দুই পক্ষের বক্তব্য শুনে সভা রায় দেয়। সেই রায় উভয় পক্ষকেই মেনে নিতে হয়। কিন্তু কোনো পক্ষ যদি অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে নালিশ না ক'রে চুপচাপ সয়ে যায় তাহলে সে ব্যাপার নিয়ে গ্রাম-সমাজ মাথা ঘামায় না। তবে যদি কোনো স্ত্রী স্বামীর বাড়ি থেকে মার বাড়ি এমনি চুপ্‌চাপ চলে যায় এবং তার মা-বাবা মেয়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় তাহলে তারা

মেয়েকে আইবুড়ো মেয়ের মতো রাখবে! কিন্তু যত দিন পর্যন্ত না জামাইটা আর একটি 'সাঙা' করছে ততদিন মেয়েটিকে 'সাঙা' করাবে না। যদি পুরুষটি আগে অন্য স্ত্রী নিয়ে সংসার শুরু করে তাহলে তার ছাড়ুই বৌয়ের নৈতিক তথা সামাজিক দোষ-দায়িত্ব খণ্ডন হয়ে গেল। আরো একটি কথা, যদি স্ত্রী চলে যাবার পরে স্বামীর চেতন হয় যে সে অন্যায় করেছে তাহলে স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে আবার ভাঙা সংসার জোড়াও লাগে। এ সম্বন্ধে আর একটি বক্তব্য রেখে সাঙা বিয়ের প্রসঙ্গ শেষ করব।

সাঁওতাল পুরুষ ছাড়ুইয়ের পর একা-একা বেশি দিন থাকতে পারে না; আর ছাড়ুই মেয়ের মা-বাবা ছাড়ুই মেয়েকে বেশিদিন একা রাখতে চায় না; তবে ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হয় অনেককে। আবার পুনরায় সাঙা করার ছাড়পত্র পেলেও অনেক মেয়ে চট করে সংসারী হতে চায় না; যতটা পারে কিছুদিন উড়ে বেড়াতে চায়। মা-বাবা এ নিয়ে বেশি জোর করে না, তাদের জোর খাটে না। সঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে এক্ষেত্রে মেয়ে-পুরুষ উভয়েই এতো স্ব-স্ব প্রধান যে দেখে আশ্চর্য হতে হয়। একে তো অর্থনৈতিক ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল, তার ওপর সঙ্গী নির্বাচনে সমাজ তাদের প্রচুর আত্মপ্রাধান্য দিয়েছে। এজন্য যে অঘটন ঘটে না তা বলছি না;[১] বরং বলব দিন দিন এই অঘটনের সংখ্যা আগের তুলনায় বহুলাংশে বেড়ে গেছে, বেড়েই চলেছে। কেন এমন হচ্ছে? সেকথা বুঝতে হলে এদের সমাজ-ব্যবস্থাকে শুধু দায়ী করলেই হবে না; এদের ধর্মীয় ও নৈতিক, এমন কি আমি বলব এদের অস্মিতার বিকাশের পথে অনেক মনোবৈজ্ঞানিক ঘটনার পর্যালোচনা দরকার।

বাপলার মতো সাঙার জন্য যোগাযোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটকদারের মাধ্যমেই হয়ে থাকে; বিশেষ করে যেখানে মা-বাবা আগ্রহ নিয়ে তাড়াতাড়ি মেয়েকে পাত্রস্থ করতে চায়। যেখানে সাঙা উভয় পক্ষের মনামনি হয়ে ঘটে সেখানেও অনুষ্ঠান খুব সংক্ষিপ্ত অথচ শোভন হতে পারে। যেমন আগে থাকতেই দিনক্ষণ ঠিক করে নেওয়া হয়।

১. এ বিষয়ে ঘটনার পারম্পর্য পাঠক পাবেন লেখক প্রণীত 'আলেখ্য' পুস্তকে বর্ণিত ছাড়ুই মেয়েদের প্রসঙ্গে।

বরপক্ষের পাঁচজন লোক (বর যাবে না) মেয়ের বাড়ি যাবে। তাদের সঙ্গে থাকবে একটি মার্কিন কাপড়ের পরিধান। এইটিতে হলুদ ছেটানো দাগ থাকবে (ছোপানো নয়) মাত্র। এই মার্কিনখানি মেয়ের বিয়ের শাড়ি। বরযাত্রীরা কনের বাড়ি কিছুক্ষণ থাকার পর নতুন কাপড়খানি মেয়েকে পরিয়ে রওনা দেবে ; তাদের সঙ্গে মেয়ের ঘরের পাঁচজন মাত্র লোক যাবে। ভাবি শ্বশুরবাড়ি পেঁৗছলে মেয়ে পা ধুয়ে ঘরে উঠবে। সেখানে তাকে একখানি কাঠের পিড়িতে বসতে দেবে (চাটাইয়ে নয়)। এরপর খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে ছেলে-মেয়ে দুজনকে পাশাপাশি বসাবে। একটি সাদা ফুলে তিনবার সিঁদুর লাগিয়ে ছেলেটি মেয়ের খোঁপায় গুঁজে দেবে। পরে অবশ্য ছেলের মা বা মাস্থানীয়া কেউ মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেবে। সাধারণত সেই দিনই মেয়ের বাড়ির লোকেরা বাড়ি ফিরে আসে। মেয়ে নতুন স্বামীর ঘরে থেকেই যায় দু-তিন দিন। তারপর স্বামীর সঙ্গে আবার মার কাছে দু'একদিন থেকে যায় ; আবার যায়। এইভাবে এই সাঙা বিয়ের পালা শেষ হয়।

এই সাঙা বিয়ের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ কয়েক প্রকারের দেখেছি। তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই, তবে একটি মাত্র এখানে উল্লেখ করছি। স্ত্রীলোকটির বয়স বছর তিরিশ হবে, তার সঙ্গে যোগাযোগ হল এক মাঝির, ঐ মাঝির দিদির মাধ্যমে। দিদির বাড়ি মাঝি ক'দিন যাতায়াত করল ; মেঝেনটিও অল্প সময়ের জন্য ঐ বাড়িতে গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করে আসে। হঠাৎ একদিন ঐ মেঝেনটি ঐ দিদির বাড়িতে গেল, আর ফিরল না। পরে জানা গেল সেই দিনই মাঝির বাড়ি থেকে কয়েকজন ঐ দিদির বাড়ি এসেছিল এবং তাদের সঙ্গেই মেঝেনটি চলে গেছে তার নির্বাচিত নতুন লোকের ঘরে। সেই থেকে সেখানেই সে রইল। খোঁজ করতে জানা গেল যে সে তো সাঙা করেছে, অমুক গ্রামের অমুক ব্যক্তিকে।

'ইতুত' আর একপ্রকারের বিয়ে। এই পদ্ধতিতে কোনো পুরুষ কোনো মেয়েকে (উভয়েই অবিবাহিত) সঙ্গী করবে বলে পছন্দ করেছে কিন্তু মেয়েটির তাকে পছন্দ নয়। বাঁধা পথে অগ্রসর হয়ে পুরুষটি যদি ঐ মেয়েটির সম্মতি আদায় না করতে পারে তখন সে সুযোগ খুঁজতে থাকে কোথায় তাকে বেকায়দায় পাবে। সঙ্গে দু-চারজন বন্ধুও সে যোগাড় করে নেয় নিজের কাজে লাগাবার জন্য। এইভাবে একদিন হাটে-বাজারে বা

কোনো মেলা-খেলায় ঐ মেয়েটির সিঁথিতে যদি একবার সিঁদুর লাগিয়ে দিতে পারে তাহলেই পুরুষটির কার্যোদ্ধার হয়ে গেল। এ কাজটা সে সর্বসমক্ষেই করে যেখানে তার দলের লোকেরা এবং মেয়ের দলের সঙ্গীরা থাকবে। অনেক সময় কিছুটা ধস্তাধস্তিও হয়। পুরুষটি এতো কাণ্ড করেও যদি সিঁথিতে সিঁদুর না দিতে পারে তাহলে সে আসামীতে পরিণত হবে; সমাজ তার বিচার করে জরিমানা করবে। অর্থদণ্ডের চেয়ে বড়ো শাস্তি হচ্ছে অপমান। একজন যুবক একজন যুবতীর কাছে হেরে গেল, হেয় হল! এইভাবে সর্বসমক্ষে অপদস্থ হওয়া মানে অপমানের চূড়ান্ত।

সিঁদুরের বদলি মাটি নিয়ে সিঁথিতে ঘষে দিলেও একই কাজ হয়। এই প্রসঙ্গে একজন গ্রাম্য পুরোহিত (নায়েকে) অল্প হেসে যে কথাটি বলেছিল তা প্রণিধানযোগ্য। তাই তার উত্তরটা এখানে তুলে দিচ্ছি।

"ওটা কি রকম হয় বুঝলেন না? এর মধ্যে কিছু চালাকি আছে. সেটা আপনারা ধরতে পারবেন না, আমরা পারি।"

"কি রকম?"

"বুঝলেন না, আসলে ওদের দুজনার মধ্যে আগে থেকেই"— আর একবার হেসে নিয়ে বলল—

"এবার বুঝে নিন, ওই হল আর কি!"

আমি যেটা বুঝেছি সেটা হয়তো আপনিও বুঝেছেন। একটু পরে সে কথায় আমি আবার আসছি। হাঁ, আগে যা বলেছিলাম। কিন্তু পুরুষটি যখন মেয়েটির আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তার মাথায় সিঁদুর দিতে পেরেছে তখন ব্যাপারটা হয়ে গেল অন্য রকম। মেয়েটির সামনে তখন দুটো পথ খোলা: অবাঞ্ছিত পুরুষের কায়িক শক্তির কাছে তার মানসিক সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে তার অঙ্কশায়িনী হওয়া, এইটাই সহজ পথ। অন্য বন্ধুর পথটি হল, এতৎ সত্ত্বেও পুরুটিকে প্রত্যাখ্যান করা; কিন্তু এর জন্য তাকে বেশ কিছু খেসারত দিতে হবে।

আগেই বলেছি অনেক লোকের সামনে মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুর বা মাটি লেপে দিয়ে ছেলেটি যে মেয়েটির উপর দাবি করেছে তার সাক্ষী রেখেছে। এ কাজটা অপছন্দ হলেও তাকে আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না, অপরাধ বা অন্যায় হয়েছে জানলেও তাকে ঝেড়ে ফেলা যাবে

না। এইটাই হল সমাজের অনুশাসন। কিন্তু যদি মেয়েটি ঐ ছেলেটিকে পছন্দ না করে তাহলে সে ব্যাপারেও ফয়সালা তাকেই করতে হবে তার সমাজের মাধ্যমে।

এ ঘটনার পর মেয়েটি চলে যাবে তার মায়ের বাড়ি। ঘটনার কথা সে মাকে বলবে। নিয়ম হচ্ছে ছেলে এরূপ একটা কাণ্ড-কারখানা করে বসলে তার বাবা বা অভিভাবক প্রস্তাব নিয়ে সদলবলে মেয়ের মা-বাবার কাছে আসবে, তাদের মেয়েকে বৌ করে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তাব করবে। এই সময়ে যদি মেয়ের মত না থাকে তাহলে সে কথা ছেলের অভিভাবককে জানাতে হবে, সে কথা জানাবে মেয়ের গ্রাম-সমাজ। উভয় পক্ষের সামনে মেয়েকে সে কথা বলতে হবে যে, সে এই 'ইতুতে' রাজি নয়, মানবে না। তখন সমাজের রীতি অনুযায়ী ছেলের পক্ষকে জরিমানা করা হবে। জরিমানা আদায় দিলে তারা এবং তাদের ছেলে নিষ্কৃতি পাবে। কিন্তু মেয়েটিকে নিষ্কৃতি পেতে হলে সমাজের নিয়ম অনুযায়ী তাকে ছেলের হাত থেকে ছাড়া পেতে হবে, অর্থাৎ ছেলে মেয়েটিকে 'ছাড়ুই' করবে এবং এখন থেকে মেয়েটি আসলে কুমারী থাকলেও 'ছাড়ুই' মেয়ে হিসাবে গণ্য হবে। এরপর আর তার 'বাপলা' বা কুমারী বিবাহ হতে পারবে না। এখন থেকে সাঙা বিয়ের দলে ভিড়তে হবে; বা তার থেকেও অসম্মানকর বিয়েতে মত দিতে হবে। এক্ষেত্রে মেয়েটি কলঙ্কিত, এই অপবাদ গায়ে মেখে তাকে দিন-যাপন করতেই হবে। শোনা যায়, কখনো কখনো ছেলেটি প্রতিহিংসাবশত মেয়েটিকে ছাড়ুই করতে অযথা দেরি করে যাতে নাকি ঐ মেয়েটি আরো বেশি জব্দ হয়।

এই কারণেই অনেক মেয়ে অবাঞ্ছিত পুরুষকেও স্বীকার করে নেয়। এতে মা-বাবা অর্থাৎ তাদের সংসার ও সমাজের মান-সম্মান বজায় থাকে এবং অর্থদণ্ডের হাত থেকেও নিষ্কৃতি পায়। মেয়েটি ঐ পুরুষটিকে প্রত্যাখ্যান করলে, যেহেতু তাকে কেন্দ্র করে একটা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে সেইজন্যই সমাজ তার মা-বাবাকে কিছু জরিমানা করবে, এইটাই নিয়ম।

আর অস্বীকৃতকে স্বীকার করে নিলে মেয়ের সামাজিক দিক থেকে একটা লাভ আছে। তা হচ্ছে, এই ইতুত বিয়েতে যে অনুষ্ঠানটা তাকে কেন্দ্র করে হবে সেটা তো এই বিয়ে অস্বীকার করলে সে জীবনে আর

কখনো পাবে না। এইখানে বলে রাখি, বাপলা বিয়ে সর্বাপেক্ষা গৌরবের সে কথা আগেই বলেছি। ক্রমিকভাবে সম্মানের দিক দিয়ে বাপলার পর ইতুত। অতএব যেখানে বাপলা সম্ভব নয় সেখানে ইতুত বিয়ের আশা অনেক ছেলেমেয়েই করে থাকে। ইতুত কুমার-কুমারীর বিয়ে তো। এতে যেমন সম্মানটা কিছু কম তেমনি খরচটাও কম। এই সূত্রে আরো একটু জানিয়ে রাখি। বাপলাতে কনেকে ঝুড়িতে বসিয়ে একটি অনুষ্ঠান আছে সেকথা আগেই বলেছি। ইতুতে ইচ্ছা করলে মেয়েকে ঝুড়িতে বসিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান করতে পারে। অর্থাৎ এ সম্মানটুকু পাবার অধিকার এই মেয়ের আছে; অন্য কোনো প্রকার বিয়েতে এ অধিকার মেয়েকে দেওয়া হয় না।

বাপলার খরচের হিসাব আগেই দিয়েছি, এখানে ইতুত বিয়ের খরচের সংক্ষিপ্ত হিসাবটি দিচ্ছি। ইতুতে নিয়ম-অনুযায়ী বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে পুরো পণ দেবে; আর দেবে সমাজকে মদ খাওয়ার পুরো খরচটা। মেয়ের সম্মতি আছে একথা জেনে বরপক্ষ যখন কন্যাপক্ষের কাছে মেয়ে নিয়ে যাবার জন্য আসবে তখন তারা সঙ্গে করে দুটো খাসি নিয়ে আসবে। আর কন্যাপক্ষ যখন এই ইতুতে রাজি হবে তখন তারাও একটা খাসি সমাজকে খাওয়াতে বাধ্য থাকবে। অতএব বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ দুয়ে মিলে তিনটে খাসি মেরে এবং উভয়পক্ষই সাধ্যমত মদ দিয়ে সমাজের ভোজটা নেহাৎ মন্দ হয় না। গ্রাম ভোজ খেয়ে ঐ মেয়ের গুণগান গেয়ে মেয়েকে বিদায় দেবে। এইভাবে বরপক্ষের লোক মেয়েকে তাদের গাঁয়ে নিয়ে তুলবে। সেখানে তাদের সাধ্য এবং ইচ্ছামত সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে বিবাহ-পর্ব শেষ করবে। শেষ হলেই কন্যাপক্ষের লোকেরা বাড়ি আসবে। দু'চারদিন গত হলে জামাই বৌ নিয়ে এক সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি বেড়িয়ে যাবে।

এরই মধ্যে আমি পাঁচ রকমের বিয়ের কথা বলেছি। এছাড়া আরো কয়েকটি পদ্ধতি আছে। এগুলোকে সমাজ সম্যক মর্যাদা না দিলেও সমাজকে মেনে নিতে হয়। এই দিক থেকে সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে এই বিবাহ-পদ্ধতিগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে মনে করি।

যেমন, 'টিকা-সিঁদুর' এক প্রকার বিয়ের নাম। একদিন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়। ছেলে–মেয়ে উভয়েই রাজি, তাদের মা-বাবা

রাজি। উভয়পক্ষ মিলে একটা দিন ঠিক করল তাদের সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বাজনাবাদ্যি কিছুই নেই, যজ্ঞির হাঙ্গামা নেই। কেবল যে যার পঞ্চায়েতের সভ্যদের মদ খাওয়ালেই চলবে।

এই বিয়েতে কনে একধারে বসে থাকবে, ছেলে অর্থাৎ বর তার কাছে গিয়ে সর্বসমক্ষে মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে দেবে। এইটি হল সবচেয়ে কম খরচে 'বাপ্‌লা' বিয়ে। কিন্তু এটা 'বাপ্‌লা' হলেও 'কিরিং-বহু' নয়; অর্থাৎ কন্যার জন্য বরপক্ষকে মূল্য বা পণ দিতে হয় না। যেটা আসল 'বাপ্‌লা'য় অবশ্যই দিতে হবে।

এক বছরের মধ্যে এই অঞ্চলের একটি গ্রামে এরূপ দুটো বিয়ে হতে দেখলাম।

আর একটি সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ার বিয়ে; তার নাম 'বাহা ডোর বাপলা' এই বিয়েতে পাত্র-পাত্রী দুজনেই সকলের সামনে গ্রাম থেকে এক দৌড়ে নিকটস্থ বনের মধ্যে চলে যাবে। সেখানে একজন আর একজনের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেবে এবং আর এক দৌড়ে গ্রামে ঢুকেই একটি ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবে। এদের বিবাহিত ব'লে সমাজ মেনে নেবে। এরপর মদের আসর বসবে, ব্যস্। এই ধরনের বিয়ে এই অঞ্চলে প্রচলিত নেই বলেই মনে হয়; কারণ খোঁজ করে সন্ধান পাই নি।

বাপলাকে যেমন 'কিরিং-বহু' বলে; তেমনি 'কিরিং-জঁায়াঁই' বলে এক ধরনের বিয়ে আছে। আক্ষরিক অর্থে হবে 'জামাই-ক্রয়'। এই বিয়েটা কি রকম তাই এখন বলছি।

যদি কোনো মেয়ে জ্ঞাতি-কর্তৃক অন্তঃসত্ত্বা হয় বা এমন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে তার নাম প্রকাশ করতে রাজি নয় (incest), তখন মেয়ের বাবা-মা চেষ্টা করে অন্য কোনো যুবক যাতে তার মেয়ের ভার নিতে রাজি হয়। ঐ যুবক পঞ্চায়েতের কাছে সে কথা স্বীকার করলে পঞ্চায়েত তাদের মিলনকে সমাজসিদ্ধ করে নেয়।

এ ক্ষেত্রে উক্ত যুবকটিকে মেয়ের ঘর থেকে দেওয়া হয় এক জোড়া বলদ, একটি গাই-গোরু ও কিছু ধান। ক্ষেত্র বিশেষে মেয়ের বাপ দানের এই জিনিসগুলি দোষী ব্যক্তির অভিভাবকের কাছ থেকে গোপনে আদায় করে নেয়। সমাজ মেনে নিলেও যে ঘরের মেয়েকে নিয়ে এরূপ ঘটনা ঘটে সেই পরিবারের পক্ষে সম্মানহানি হয়। এজন্য গৃহস্বামী চেষ্টা করে

সত্যি ঘটনাকে চেপে দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা অন্যভাবে পেশ করতে। যেমন নির্বাচিত যুবকটিকে দিয়ে সমাজের কাছে কবুল করানো হয় যে তার সঙ্গে ঐ যুবতীর প্রেম ছিল, তারই ফলস্বরূপ ঐ মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে ; জাতকের পূর্ণ দায়িত্ব তার। তখন সমাজ সানন্দে দুজনকে বিবাহিত দম্পতি বলে স্বীকার করে নেয়। অবশ্য এই ব্যবস্থা মেয়েটি সন্তানসম্ভবা হয়েছে জানতে পারার পর যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নেওয়া হয়।

এই বছরের মধ্যেই নিকটস্থ একটি গ্রামে এরূপ একটি বিয়ে হয়েছে। উপরন্তু মেয়ের বাবা যুবকটিকে (মেয়ের থেকে বয়সে ছোটো) ঘর-জামাই করে নিয়েছে। ঐ যুবকটির বাবা-মা উভয়েই মৃত এবং ঘর বিচারে মেয়ের ঘরের সঙ্গে বিবাহ সমাজসিদ্ধ।

আর একটি বিয়ে যার নাম 'নির-বল'। এটা 'ইতুত' বিয়ের উল্টো। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মেয়েটি ছেলেটির বাড়ি চড়াও হয়। পূর্বরাগ পর্যায়ে ঐ ছেলের সঙ্গে প্রেম-কাম হয়েই থাকে। পরে ছেলেটি সরে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে মেয়েটি বাঁধা পড়ে গেলে তখন মরিয়া হয়ে ছেলেটির বাড়ি জবর-দখল করার চেষ্টা করে। সেই বাড়িতে ছেলের মা-ই সাধারণত এতে আপত্তি করে, তার কারণ ছেলের বিয়েতে পাত্রী নির্বাচন তারই এক্তিয়ারের মধ্যে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তার সম্মতি ছাড়া ঘরের বৌ হওয়া কারো সাধ্য নেই। সেইজন্য মেয়েটির মতলব বুঝে সে গালমন্দ থেকে শুরু করে লংকা পুড়িয়ে ঝাঁঝ দিয়ে পর্যন্ত চেষ্টা করে ঐ মেয়েকে তার বাড়ি থেকে বিদায় করতে। কিন্তু এতেও যদি ঐ মেয়ে বাড়ি না ছাড়ে তখন ঐ মেয়েকে ছেলের বৌ বলে স্বীকার করে নিতেই হবে ; সেই রকমই সমাজের নির্দেশ।

এই বিয়ের মধ্যে একটা চালাকি আছে। এই ফন্দীটা ছেলে-মেয়ে ও তাদের বন্ধুবান্ধবীদের যোগসাজসে আঁটা হয়ে থাকে। যেখানে পাত্রপাত্রী পরস্পরের প্রতি আসক্ত, তারা জোট বাঁধতে চায়, যতটা সম্ভব জানাজানি হয়ে গেছে, কিন্তু ছেলের মা ঐ মেয়েকে বৌ করতে যে কোনো কারণেই হোক রাজি নয় ; এই অবস্থায় 'নির-বল' প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিয়ে তারা কার্যোদ্ধার করে। এতে মেয়েটিকে অবশ্য কতকটা নির্যাতন সহ্য করতে হয় ; কিন্তু সমস্ত পরিস্থিতিটা গ্রামের আর সকলের কাছে বেশ একটা উত্তেজনা ও আনন্দের খোরাক জোগায়।

এই অঞ্চলে 'নির-বল' বিয়ে হওয়ার সন্ধান কেউ দিতে পারে নি। তবে এরূপ কাণ্ড যে ঘটে তা কেউ-কেউ শুনেছে। হয়তো দূরে, আরো গ্রাম্য পরিবেশে এরূপ বিয়ে হয়ে থাকে। এই অঞ্চলে ছেলেরা আমার মুখে এই বিয়ের কথা শুনে খুব মজা উপভোগ করল। ভাবটা এটা তো মন্দ নয়।

আর এক রকমের বিয়ে, যার নাম 'হিরোম চেতান।' সাঁওতাল পুরুষ সাধারণত একটি স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করে। এই ব্যবস্থা ওদের সমাজে যথেষ্ট মর্যাদাও পেয়ে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী (?)-ও কেউ নিয়ে থাকে। এইখানে আমার নিজস্ব একটি বক্তব্য পেশ করে রাখি। সেটি হচ্ছে—এদের মধ্যেও পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যেই কোথায় যেন একাধিক নারী বা পুরুষের প্রতি টান আছে। সেই শক্তিটি সুযোগ পেলেই হয় পুরানো থেকে নতুনের দিকে ছোটে নয়তো পুরানোকে রেখেই গোপনে নতুনের সঙ্গে যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করে। এরূপ দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি। বিশ-বাইশ বছরের যুবক-যুবতী থেকে পঞ্চাশোর্ধ নারী-পুরুষকে এই অভিযানে মত্ত হতে দেখেছি, এই অঞ্চলেই। এ যেন এই সমাজের সর্ববিদিত গোপনতা।

যা বলছিলাম। সাময়িকভাবে অন্য কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষটি যখন "লট্‌ঘটি" অর্থাৎ যোগাযোগ ক'রে চলে তখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রথম স্ত্রীর অশান্তি হয়। সেই অশান্তি সংসারে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আগুনে ঘি ঢালার মতো পুরুষটি তার দ্বিতীয়ার প্রতি আরো বেশী করে ঝুঁকে পড়ে এবং দরকার হলে নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বাসা বাঁধতেও ত্রুটি করে না। এটা বললাম একটা বেপরোয়া দৃষ্টান্ত হিসাবে। কিন্তু 'হিরোম-চেতানে' যা হয় তা হচ্ছে, প্রথমা স্ত্রী দ্বিতীয়াকে সতীন করে নেয়; কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান ছাড়াই (অবশ্য গ্রামের মাতব্বরদের মদটা খাওয়াতেই হয়)। প্রথমার যদি তার পুত্র-কন্যাদের নিয়ে সংসারের উপর যথেষ্ট দখল থাকে তাহলে এই দ্বিতীয়া বা 'ছুটকি'কে রক্ষিতা হিসাবে কাল কাটাতে হয়। নয় তো তাকে আবার একটি নতুন সংসার পাতার চেষ্টা দেখতে হয়।

এই ছুটকি বা রক্ষিতাকে সামাজিক অনুষ্ঠানের কোনো কাজে সাধারণত অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। অর্থাৎ তার সামাজিক মর্যাদা সীমিত। এই অঞ্চলে দেখেছি ছুটকির প্রতি সমাজ যথেষ্ট সদয়।

দেখেছি দুই সতীনের মধ্যে কোনো প্রভেদই প্রায় করে না। অবশ্য ছুটকি যদি সিঁথিতে সিঁদুর নিজে নেয় তাতে কেউ আপত্তি করে না। শোনা যায় এমনও অঞ্চল আছে যেখানে ছুটকিকে মৃতুর পরে স্বামী তার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে শেষ-বিদায় দেয়।

সাঁওতালদের মধ্যে বিয়ের সমাজ-চল সম্বন্ধে আর একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গের শেষ করব। সাধারণভাবে জানা যায় বড়ো ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে ছোটো ভাইয়ের সম্পর্ক অর্থাৎ দেওর-ভাজ সম্পর্কটা গুপ্ত প্রেমের শ্রীক্ষেত্র। এটা এদের সমাজ জানে, কিন্তু যেহেতু খানিকটা ছাড় সমাজই দিয়ে রেখেছে তাই কোনোদিক থেকে সরাসরি আপত্তি না উঠলে এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। দেওর যদি মৃতদার হয় এবং ভাজ যদি বিধবা হয় তাহলে বয়সের বিচার না করে তারা দু'য়ে মিলে নতুন সংসার চালু করতে ইতস্তত করে না। এজন্য সমাজকে একদিন মাতাল-শালে হাঁড়িয়া খাইয়ে দিলেই হল। এই অঞ্চলে এরূপ একজন মাঝির সঙ্গে একদিন কথা হচ্ছিল। তার গ্রামে বসেই কথা হচ্ছিল। কোনো একটি কাজের কথা বলতে সে আমাকে বলল—

—"বাবু আপনাকে তো অনেক দিন থেকেই চিনি ; আপনি আমায় চিনতে পারেন নি। আমার নাম নিতাই।"

—"তোমার বাড়ি কোনটা ?"

—"কেন, এইতো ; এইটাই তো আমার বাড়ি।"

—"এটা তো শিবুর বাড়ি। সে তো মারা গেছে। তবে কি—"

—"হাঁ বাবু আমি তো দাদার বৌকেই রাখলাম।" বলেই সঙ্গে-সঙ্গে সে বলল,

—"আমাদের সমাজে এটা চলে তো।"

বললাম—"তা বেশ। কিন্তু শিবুর ছেলে শংকর কোথায় ?"

তৎক্ষণাৎ সে উত্তর করল,— "কেন এই যে।" বলে আমার সামনেই একটি ঘর দেখিয়ে দিল এবং বলল—"এইটা শংকরের ঘর করে দিলাম। শংকরের বিয়ে দিলাম দু'বছর হল।"

বয়স নির্বিশেষে বড়ো ভাইয়ের বিধবাকে বিয়ে করার পক্ষে সামাজিক দিক থেকে একটা বিচক্ষণতার পরিচয় আছে, যেটা এদের মনে বেশ দাগ কেটে বসে আছে। নিতাইয়ের বক্তব্যের পিছনে সেই

ভাবটাই কাজ করছে। সেটি হচ্ছে, বড়ো ভাই মারা গেলে তার পুত্র কন্যাদের মানুষ করার ভার তো ছোটো ভাইয়ের উপরই পড়বে। কিন্তু যদি ছোটো ভাই শুধু কর্তব্যবোধে বড়ো ভাইয়ের সংসারের বোঝা বয়ে বেড়ায় তাহলে অল্পদিনেই সে বোঝা গুরুভার হয়ে দাঁড়াবে। অতএব এই দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এই নিয়মটা খুবই প্রশংসনীয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর অন্য দিকও আছে বৈকি।

শিবুর ছেলে শংকরের সঙ্গে কথা বলেছি। জোয়ান-মদ্দ ছেলে। এখনো কোনো সন্তানাদি হয় নি। স্বামী-স্ত্রীর বেশ পরিচ্ছন্ন সংসার। সম্পর্কে এক বোন, নিরলম্ব মানুষ, তাকেও একটু আশ্রয় দিয়েছে নিজের বারান্দাটা ঘিরে। শংকরের মনে কাকার প্রতি কোনো আক্রোশ হয়তো নেই। কিন্তু তাই বলে কি একটুও গ্লানি মনে পোষণ করে না! বোধ হয় না; হয়তো বা করে। সে কথা আজ থাক।

এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাঁওতালদের বিভিন্ন বিবাহ-পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে ওদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকে বোঝার চেষ্টা করা। জানি না আমার সে উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে। তবে সমাজের গায়ে কোন্‌টা কতটা ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করেছে তা বোঝার দায় আমি প্রায় সবটাই পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়েছি। এই জন্যই এই প্রবন্ধ আমি মুখ্যত বিবরণমূলক রাখার চেষ্টা করেছি। আমার মন যেখানে মাঝে-মাঝে নাড়া খেয়েছে তার অনুভূতিটুকু দু'একটি মন্তব্যের আকারে পেশ করে এই প্রসঙ্গ শেষ করব।

সাঁওতালদের বিয়ে ছাড়াও নারী-পুরুষ সম্পর্ক সম্বন্ধে খুঁটিনাটি থেকে শুরু করে আরো অনেক কিছু বলার আছে। সে কথা এখন থাক। আমার শেষ মন্তব্যটি হচ্ছে যে সামাজিক রীতি-নীতি থেকে শুরু করে ব্যক্তির আচার-আচরণের মধ্যে যে দ্রুত পরিবর্তন এগিয়ে চলেছে তার উৎস আর যাই থাকুক, নারী পুরুষের সঙ্গী নির্বাচনে ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে যে খেলা চলছে তার মাঝে এদের সমাজ আজকের দিনে যেন খানিকটা হতভম্ব হয়ে গেছে। এক কথায় বলা যায়, যৌন ব্যাপারটাকে যে সব বাঁধনে বেঁধে মানুষ একদিন সমাজকে গড়েছিল সেগুলো আজ বেশ খানিকটা আলগা হয়ে গেছে। (এই অঞ্চলের কথাই আমি বলছি।) এটা ভালো বা মন্দ সে প্রশ্ন আমি মোটেই করছি না। আমি যেটা বলতে চাই তা হচ্ছে এদের সমাজের কাঠামোটা আজ যেন ওদের ঐ বর্ষা-বিধ্বস্ত হুমড়ি-খেয়ে-পড়া খড়ের চালটির মতো ভেঙে পড়তে চাইছে।

সপ্তম অধ্যায়

নিয়মবহির্ভূত সাঁওতালি বিবাহ

উপরোক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে দু'টি অধ্যায়ের প্রথমটিতে আমি সাঁওতালদের ঐতিহ্যগত বিবাহপ্রথা ও দ্বিতীয়টিতে সমাজ-স্বীকৃত হলেও মর্যাদার দিক থেকে সমাজে অধস্তন পর্যায়ের প্রথাগুলিকে মোটামুটিভাবে ভাগ করে বিবৃত করার চেষ্টা করেছি। এরই মধ্যে কিছু কিছু মন্তব্যও আমি করেছি বটে, তবে বক্তব্য বিশেষ কিছু রাখিনি। বর্তমান প্রবন্ধে কিছু কিছু নতুন উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য কিছু পেশ করার ইচ্ছা আছে।

বর্তমান গ্রামীন সমাজ-কর্তাদের প্রতি কিছু কটাক্ষও আমি করেছি। এরূপ করেছি সেখানে, যেখানে তাদের সমাজে দুর্নীতি ঘটেছে জেনেও তা দূর করতে বা বন্ধ করতে অপারগ হয়ে ক্রমশ নিজেরা সরে দাঁড়াচ্ছে এবং সেই সুযোগে দুর্নীতি সমাজের বুকে আরো জঁাকিয়ে বসছে।

সঁাওতালদের মধ্যে বিবাহ ব্যাপারে, বিশেষ করে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পুত্র-কন্যাদের স্বাধীনতা যে সঁাওতাল সমাজে আজো আছে তা মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে সত্যিই খুব তাৎপর্যপূর্ণ; যা শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মধ্যেও এককালে বিরল ছিল এবং এখনো মুষ্টিমেয় হিন্দু-গোষ্ঠির মধ্যে কার্যত যা দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই স্বাধীনতার পিছনে যে পথ-নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ শক্তি কাজ করত সেদিকে লক্ষ্য না করে যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতাটাকেই বড়ো করে দেখি তাহলে যে মস্ত বড়ো ভুল হবে সে ধারণা মনে হয় সঁাওতাল-সমাজের রক্তচক্ষু তাকে শাসিয়ে দিত; তাতে শায়েস্তা না হলে তখন পুরোদস্তুর শাসনের ব্যবস্থা নেওয়া হত। গ্রাম-পর্যায় থেকে শুরু করে পরগনা-পর্যায় পর্যন্ত যে শাসনব্যবস্থা সচল ছিল দরকার হলে তাকে কাজে লাগানো হত। এই কাঠামোটা আজও আছে। আমার নির্বাচিত কর্মক্ষেত্রের বাইরে সেটা হয়তো আগের মতো কার্যকরীও থাকতে পারে, আমি তা সঠিক জানি না। তবে আমার কর্মক্ষেত্রের পরিধির মধ্যে আগের দিনের নির্দেশনা বা নিয়ন্ত্রণ-ক্রিয়ার অবস্থা এতই শোচনীয়

যে আমি বলতে বাধ্য হয়েছি : এদের সমাজের কাঠামোটা আজ যেন ওদের ঐ বর্ষাবিধ্বস্ত হুমড়ি-খেয়ে-পড়া খড়ের চালটার মতো ভেঙে পড়তে চাইছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্যাম ও রামের বিয়ের ক্ষেত্রে আমি সমাজের ক্ষীয়মান শাসনব্যবস্থার কিছুটা আভাস দিয়েছি। আরো দেব।

শাসনব্যবস্থার এরূপ দুর্দশার কারণ কি? কোন্ পথ দিয়ে সেই শক্তি এতো মজবুত স্বনির্ভরশীল শাসনযন্ত্রকে বিকল করছে, প্রায় অচল করে দিতে উদ্যত হয়েছে?

এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রের পণ্ডিতরা ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন বা করবেন। তাদের মধ্যে সর্বজনস্বীকৃত একটি মত হচ্ছে, এই জাতির স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে উপার্জন করার ক্ষমতা। একটি অপোগণ্ড শিশুও পেটের ভাতের জন্য তার মা-বাবার উপর সর্বতোভাবে নির্ভর না করলেও পারে। কারো ঘরে 'বাগালি' করলে আট-দশ বছরের একটি ছেলে বা মেয়ে, ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা হয়ে যায়। এই অর্থনৈতিক যুক্তিকে অস্বীকার করা ভুল হবে। এটা সাঁওতাল-সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে রয়েছে। যে-সব সাঁওতাল কোনো শহর বা কল-কারখানার কাছাকাছি রয়েছে সেই সব গ্রামগুলিতে এদের কায়িক পরিশ্রমের চাহিদা এতো বেশি যে, যদি কেউ কাজের ভালো-মন্দ বিচার না করে শুধু অর্থের পরিবর্তে যে কোনো কাজ করতে রাজি থাকে তাহলে কাজের অভাব প্রায় হয় না। ক্বচিৎ-কখনো অভাব হলে আজকাল সরকারি উদ্‌যোগে কাজের যোগান দেওয়া হয়ে থাকে। শহর বলতে মহকুমা থেকে ছোটো শহরের কথাই বলছি। কলকারখানা বলতে দুর্গাপুর, আসানসোলের কথা বলছি না, সেখানে তো কাজের সুযোগ আছেই। আমার দেখা এই বোলপুর সহরের ধারে কাছেই কতো ধানকল, তেল কল, কোলা কল ইত্যাদি বহু রকমের কাজের ক্ষেত্র রয়েছে। এছাড়া বাবুদের বাড়িতে বাড়িতে 'ঝি'-দের একটা অংশ দখল করে রেখেছে উঠ্‌তি বয়সের সাঁওতালি মেয়েরা। এদের সংখ্যা অনুপাতে দিন-দিন বাড়ছে। তপশিলী জাতির হিন্দু মেয়েদের তুলনায় অনেকেই এই স্বল্পবাক্ সাঁওতাল মেয়েদের পছন্দ করছেন আজকাল। অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে কেউ যদি এই দিকটা নিয়ে গবেষণা করে থাকেন তাহলে তাঁর কাছে থেকে আমরা আরো অনেক জোরালো যুক্তি হয়তো পেতে পারি।

আমার বক্তব্যের পরিপূরক যুক্তি হিসাবে সাধারণভাবে এইটুকুই বলতে চাই যে, ছোটো থেকেই ব্যক্তি-স্বাধীনতার শিক্ষা স্বজ্ঞানে ছেলেমেয়েরা পেয়ে থাকে কার্যকরীভাবে।

তারপর আসে তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা, পরস্পরের জুটি নির্বাচনের ব্যাপারে। এ সম্বন্ধে আমি এদের বিবাহ সম্বন্ধে যে দুটি প্রবন্ধের কথা আগেই উল্লেখ করেছি, তা থেকে পাঠকের মনে হয়তো একটা মিশ্র মনোভাবের সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। এই প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আরো যেসব আনুষঙ্গিক বিষয়ে উল্লেখ করব তা থেকে ঐ ব্যাপারে ভালো-মন্দ বিচারটি আরো স্পষ্ট হবে আশা করি।

এমন অনেক জিনিস সংসারে আছে যেগুলি সাধারণভাবে দেখলে আমরা যে চিত্রটা পাই সেইটাই আবার বিশেষভাবে অনুধাবন করলে অনেক সময় ভিন্ন চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে, বা মনে নতুন ভাবের সৃষ্টি করে। এরূপ হওয়ার কারণ দেখাতে গিয়ে অনেক সময় বলা হয়, সকলের চোখ সমান নয়, মন তো নয়ই। সেকথা মেনে নিলেও জিজ্ঞাসার উত্তরের মধ্যে অসম্পূর্ণতা থেকেই যায়। কারণ ঐ যুক্তির দ্বারা একই লোক যখন একই বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বা পরিস্থিতিতে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেন তার কারণ কি হতে পারে, তার উত্তর পাওয়া যায় না। অথচ এরূপ ঘটনা ঘটে থাকে। এই ভাব-পরিবর্তনের পিছনে থাকে পরিদৃষ্ট ব্যক্তির সচল মানসিকতা, ব্যক্তি-সংগঠিত পরিবেশের ভেদ্যতা এবং সবচেয়ে বেশি করে থাকে দ্রষ্টার নিজস্ব মানসিকতা যা বস্তুসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের চেয়ে ব্যক্তিসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয় সবচেয়ে বেশি।

এ আলোচনা আপাতত থাক। আমার বক্তব্য যখন কেবল যুক্তির দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা নয়, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির ও সমাজের আচরণের পরিবর্তনের কারণ কি কি হতে পারে সেইগুলোকে দেখার চেষ্টা করা, তখন শুধু যুক্তির দ্বারা তত্ত্ব আলোচনায় কোনো লাভ নেই।

সাঁওতালি বিবাহ সম্বন্ধে এই তৃতীয় প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল স্ত্রী-পুরুষের অসামাজিক যৌন-সম্পর্ক ও তার গতি-প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা। এই প্রসঙ্গে আমার লেখা 'আলেখ্য' পুস্তকের কথা উল্লেখ করছি। সেখানে আমরা দেখেছি গ্রামের মধ্যে সংসারে বাস করে শহরে গিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করে এরূপ একটি মাত্র ব্যক্তি, যাকে তার সমাজ প্রশ্রয় দিয়েছে।

আজ সে মৃতা, কিন্তু ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সে সমাজের বুকে বসে ঐরূপ অসামাজিক কাজ করে গেছে। তখন এই তল্লাটের আর কোনো গ্রামে এমনটি ছিল না। গোপনে ঐরূপ কাজ আর কেউ করত না সেকথা বলব না। তবে প্রকাশ্যে 'গোলাপ'ই একমাত্র ব্যক্তি যে এতদিন ধরে নিজের পথেই চলে গেছে, তার সমাজ তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি বা তাকে গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য করতেও পারেনি। এর ফল যে ভালো হয়নি তা আজকে এই গ্রাম ছাড়াও অন্যান্য গ্রামের খবর নিলেই জানা যায়। গোলাপ ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী বধূ। তার চরিত্রে এই পরিবর্তন এসেছিল স্বামী তাকে ত্যাগ করার পর। তখন থেকেই আমার দৃষ্টি ছিল 'ছাড়ুই' সাঁওতালি মেয়েদের গতিবিধির দিকে। এরা যে একদিন তাদের সমাজে ভাঙনের ঢেউ তুলবে সে আশংকা আমার ছিল। 'আলেখ্য'-তে সে সম্বন্ধে আঁচ আমি দিয়েছিলাম। আজ তা সত্যি হয়েছে। তখন থেকে এই এক কুড়ি বছরের মধ্যেই দেখেছি সাঁওতালি মেয়েরা বেশ্যাবৃত্তি করতে দল বেঁধে সেজেগুজে দিনের আলো মুছে যেতে না যেতেই শান্তিনিকেতনের বুকের উপর দিয়েই বোলপুর অভিমুখে চলেছে, আবার রাত্রিশেষে দিনের নতুন আলোয় সেই রাস্তা মাড়িয়ে তাদের দিনের আস্তানায় ফিরে যাচ্ছে। দিনের পর দিন এই ঘটনা চোখের সামনে ঘটেছে। আজ এ-ঘটনা লুকিয়ে ঘটে না; অথচ অনেকের কাছেই অজানা। এরা আমাদের সমাজে যে ঢেউ তুলেছে তার বিহিত না করতে পারলে সেখানেও ভাঙন ধরাতে পারে তা আমাদের সমাজ জেনেও জানেনি, দেখেও দেখেনি। জানি না আজও তারা দেখে কি না, জানে কিনা।

একটা সত্যি কথা জেনে রাখা দরকার, অসংবৃত যৌন-শক্তি চাক্ষুষ আগুনের থেকেও শক্তিশালী। ঘরে আগুন ধরলে চোখে পড়ে, তৎক্ষণাৎ তার প্রতিকার একটা হয়; কিন্তু বেপরোয়া কাম-শক্তি আগুন ধরায় মানুষের মনে, যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু ধীরে ধীরে সমাজকে ভেতর থেকে খেয়ে ফেলে। আজ এইরূপ সাঁওতালি মেয়ের দল আমাদের সমাজে কোথায় কতটা আগুন জেলে চলেছে সে সম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখা এবং সে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা কি সমাজের কর্তব্য নয়? শুধু কি পুলিশের হেফাজতে দিয়ে দিলেই কর্তব্যের শেষ হল?

এটা তো গেল আমাদের দিকের সমস্যা, এজন্য আসলে আমার এই

প্রবন্ধের অবতারণা নয়। আমার দ্রষ্টব্য হচ্ছে স'াওতাল সমাজ এ নিয়ে কি ভাবছে, আদৌ কিছু ভাবছে কিনা ; যদি ভাবে, শুধু ভাবছেই না কিছু করছেও, যাতে এর প্রতিবিধান কিছু করা যায় ? না আগের মতই সাময়িক উত্তেজনা দেখিয়ে তারপর একটু বেশি করে হাঁড়িয়া খেয়ে পরের দিন থেকে আবার যেমন চলছিল তেমনিই গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছে ; সেইটাই বিশেষ করে দেখা। দেখা যাক, এবারে সেখানে কি ঘটছে। গোলাপ মরে বেঁচেছে, কিন্তু যে বিষ সে ছড়িয়ে গেছে তা কি স'াওতাল-সমাজের নৈতিক চরিত্রের অধোগতিকে ত্বরান্বিত করেনি ? করেছে নিশ্চয়ই।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে এজন্য শুধু গোলাপকেই দায়ী করছি কেন ? আর সকলেই কি সতী-সাধ্বী ছিল ?

ঠিক কথা, আরো অনেকেই তখনকার দিনেই পরপুরুষকে সঙ্গ দিত। ঐ সময়ের দিকু-বাবুরা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু স্ত্রীলোকদের দিক থেকে সাঁওতাল যুবতীদের দিকে নজর দিয়েছে। এবং যেখানেই তাদের নজর পড়েছে ছলে-বলে-কৌশলে তারা নিজেদের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার পথ করে নিয়েছে। কিন্তু আমি বিশেষ করে যে জন্য গোলাপ ও তার সমাজকে দায়ী করছি তা হল, গোলাপ তার সমাজের বুকে বসে নিত্য-নৈমিত্তিক এই অ-নৈতিক কাজ প্রকাশ্যে করে গেছে তার শেষ জীবনটার শেষ পর্যন্ত। বলা যায় সমাজের অনুশাসনকে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছে, সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অসামাজিক কাজ করে গেছে। এইখানেই আমি সমাজকে এবং গোলাপকে একসঙ্গেই দোষী মনে করছি। আমার বিশ্বাস আমি ভুল করিনি। সমাজকে আমি দোষী করেছি এই জন্য যে, সে সাহস করেনি গোলাপের শাস্তিবিধান করতে। অর্থাৎ সমাজে মাতব্বরদের ঘরোয়া (সুপ্ত) দুর্বলতাগুলো গোলাপ ভালো করেই জানত, তার কর্মের সমালোচনা করলে সে যে-জাতের মেয়ে তাতে সে চুপ করে মুখ বুজে সহ্য করত না, মাতব্বরদের ঘরোয়া কেচ্ছার পুঁটুলি এলিয়ে ধরত সমাজের সকলের সামনে। অতএব তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে উপায় ছিল না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রকল্প ছিল যে স'াওতাল সমাজে ঘুণ ধরতে শুরু করেছে, এর অবশ্যম্ভাবী কুফল হল সমাজ-চরিত্রের অবনতি, এবং এর থেকেই আসবে এই আদিম জাতির নিজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে

ভাঙন। ফলে আজকের সমাজ যেমন গোলাপকে ভাসিয়ে দিয়েছে তার সাংসারিক নোঙর ভেঙে, সাঁওতাল সমাজও একদিন গোলাপের মতো মেয়েদের দ্বারা লাঞ্ছিত হবে। তারপর কি হবে তা আমার ধারণায় তখন আসেনি। এখন চেষ্টা করলে হয়তো কিছুটা ধারণা করা যায়।

যে সব পাঠক 'আলেখ্য' পড়েন নি, তাঁদের সুবিধার জন্য খুব অল্প কথায় গোলাপের বিচিত্র চরিত্রের কাহিনীটি বলার চেষ্টা করছি :

গোলাপ তার স্বামী ও তাদের তিন চার বছরের এক পুত্র নিয়ে নিজেদের কুঁড়েঘরে কষ্টের ভাত সুখ করে খেয়ে দিনাতিপাত করত। বড়ো ননদের সঙ্গে সে দিনমজুরি করতে যেত। ননদের অবৈধ কাম-সম্পর্ক ছিল যেখানে ওরা দুজনেই কাজ করত সেখানের জনৈক দিকু বাবুর সঙ্গে। গোলাপের বয়স ননদের বয়স থেকে অনেক কম এবং তুলনায় সে ননদের থেকে দেখতে সুশ্রী ছিল। দিকু বাবুদের নজর ননদকে ছেড়ে গোলাপের উপর পড়ল। ননদ দালালি শুরু করে, কিন্তু গোলাপ কিছুতেই 'খারাপ' কাজ করতে রাজি হয় না ; ছিঃ ছিঃ বলে ননদকে ধিক্কার দেয়। এই থেকেই দুজনের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়। এর ফলে ওদের আলাদা কুঁড়ে বাঁধতে হয়। গোলাপ তার স্বামীকে অকপটে সব কথা বলে। স্বামীভাগ্য গোলাপের ভালোই ছিল। কিন্তু ননদিনী কাল-নাগিনী হয়ে তার সংসারে বিষ ঢেলে দেয়। ননদিনী ছোটো-ভাইয়ের মনে সন্দেহের আগুন ধরিয়ে তাকে ভাজের কাছ থেকে সরিয়ে নেয়। গোলাপ শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তার বাপ-মায়ের গাঁয়ে চলে যায়। সেখানে তাদের আশ্রয়ে থেকে সৎপথে জীবিকা-অর্জনের চেষ্টা অনেক দিন ধরেই সে করেছে। কিন্তু কালক্রমে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে গোলাপের জীবন জর্জরিত হতে থাকে। অবশেষে তার অভিজ্ঞা ননদিনী তাকে অনেকদিন আগেই যে পথে চালিত করতে চেয়েছিল শেষ পর্যন্ত, খুব সম্ভবত তার গর্ভধারিণীর পথ-নির্দেশেই, সেই সহজ পথ গোলাপ বেছে নেয় তার পেট এবং মন ভরাবার উপায় হিসাবে। পেট তার ভরতো, কিন্তু মন তার কোনোদিনই ভরেনি। মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়ে সে তার সব জ্বালার হাত থেকে নিস্তার পেল।

এই হল সংক্ষেপে গোলাপের কাহিনী।

গোলাপের শ্বশুরবাড়ির গ্রাম ছিল আমাদের খুব কাছেই। গোলাপের মায়ের ঘর তার স্বামীর ঘর থেকে কিঞ্চিদধিক এক মাইল দূরে। সেখান

থেকে আরো একমাইল দূরের গ্রামের তদানীন্তন একটি ঘটনার কথা এবার বলি।

এই গ্রামের একটি যুবতীর অক্ষমনীয় যৌনসম্পর্কের জন্য সমাজ তার পিতাকে জরিমানা করে। কিন্তু এতে ঐ মেয়েকে অসামাজিক কাজ করা থেকে নিরস্ত করা যায়নি। ঐ মেয়ে একদিন ধরা পড়ল। সমাজ তার বিচার করল। সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত হল যে ঐ মেয়েকে আর গ্রামে রাখা চলবে না। অর্থাৎ বাবা-মার প্রতি নির্দেশ হল মেয়েকে ত্যাগ করার। তাই হল। এইটাই সাঁওতালি শাসন-ব্যবস্থায় নিয়ম। কিন্তু মেয়ে যাবে কোথায়? দিকু-বাবু তো তাকে নিয়ে ঘরে তুলবে না, নতুন ঘরও বাঁধবে না। পড়ল সে তখন মুস্কিলে। কয়েক দিন কোনো রকমে কাজের সঙ্গে একটা আস্তানা যোগাড়ের চেষ্টায় খুব ঘোরাঘুরি করল। এই সময়ে আমার সঙ্গে তার মোলাকাত হয়। তাকে পুনর্বাসিত করার চেষ্টায় তাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ হয় আমার। কোনো পক্ষই সহৃদয়তার পরিচয় দেয়নি তার সমস্যার সমাধানে।

সাঁওতালি মেয়ে অবস্থা বুঝে নিজের চেষ্টায় যা পারল করল। অসৎপথের সঙ্গী জুটতে তার দেরি হল না। নতুন জুটির সঙ্গে এই এলাকা ত্যাগ করে সে নিরুদ্দেশ হল। অন্য সূত্রে শুনলাম সে তখন গুস্‌করাতে ঘর বেঁধেছে।

কয়েক মাস পরে শুধু মেয়েটিকে এই অঞ্চলে আবার দেখা গেল। এখানেই সে একটি ওড়িয়া মিস্ত্রীর সঙ্গে জুটে বোলপুর সহরের উপকণ্ঠে দ্বিতীয় বার ঘর বাঁধল। অনেক দিন পরে আমার কৌতূহল মেটাবার জন্য এবং সরেজমিনে চাক্ষুষ করার জন্য যেদিন তার বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম সেদিন দেখলাম তার কোলে একটি ছোট্ট শিশু। সে এখন সুখী সে-কথা বলতে দ্বিধা করেনি। মিস্ত্রী বয়সে তার থেকে অনেক বড়ো হলেও লোকটা ভালো' সেকথা অকুণ্ঠে সে স্বীকার করেছে। তার মাও যাতায়াতের পথে তাদের খোঁজ নিয়ে যায়।

এই যে মাত্র এক মাইল দূরের দু'টি গ্রামের দু'টি ঘটনা, বিচার করলে দু'টি সমাজ চরিত্রের আলেখ্য স্পষ্ট করে বলে দেয় দুটোর মধ্যে কত তফাৎ। কিন্তু তফাৎটা মূলত কোথায়? দূরের গ্রামটির পক্ষে একটি অশালীন মেয়েকে বলার সাহস ছিল যে, সে যে অন্যায়

করছে তা থেকে নিবৃত্ত না হলে তাদের গ্রামে তার স্থান হবে না; কাছের গ্রামটির পক্ষে এরূপ কঠিন শাস্তির বিধান দেওয়ার সাহস ছিল না, কারণ গোলাপ তার মা-বাবার, বিশেষ করে মায়ের প্রশ্রয় পেয়েছিল, এবং সমাজে অন্য সংসারেও যে অবৈধ কামের চোরাচালান চলত সে কথা সে জানত। প্রথমে সে তার মায়ের কাছে শুনেছে এবং পরে সে নিজের চোখে দেখেছে। তাই সে যখন বেশ্যাবৃত্তিকে তার পেশা করে নিয়েছিল তখন তাকে শাসন করতে গেলে অন্য সব বাড়ির সমস্ত মেয়ের গোপন কাহিনী ফাঁস করে দেব বলে শাসিয়েছে। শুধু মিথ্যা ভয় দেখানো নয়, দরকার হলে সে তা প্রকাশ করতে পারত সে পরিচয় সে দিয়েছে।

তাহলে কি বলা চলে না যে, সমাজের শাসন-ব্যবস্থার দুর্বলতার পিছনে রয়েছে শাসক-গোষ্ঠীর কিছু লোকের পারিবারিক জীবনে অবৈধ কাম-জনিত ক্রিয়াকলাপের প্রশ্রয়, যা নাকি গোপনতার পর্দা ভেদ করে গ্রামীন সমাজের কাছে জানাজানি হয়েছে, তবে সম্ভবত গ্রামের বাইরে ধরা-ছোঁয়ার মতো অবস্থায় পৌঁছোয়নি। গোলাপ সমাজকে শাসিয়েছিল; তখন গ্রামের শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয়ে গোলাপকে রেহাই দিয়েছে। কিন্তু তাকে পাগল বানিয়ে, তার অবৈধ কাজকর্মকে ব্যতিক্রম বলে জাহির করেছে।

উপরোক্ত ঘটনা দুটি ঘটেছিল এখন থেকে প্রায় বছর উনিশ কুড়ি আগে। এই কয়েক বছরে সাঁওতাল সমাজে অসামাজিক কাজকর্ম, বিশেষ করে অবৈধ কামের যে বন্যা বয়ে গেছে তার রোজনামচা দেবার ইচ্ছা আমার নেই, তবে হালফিল দু'এক বছরের মধ্যে ঘটেছে এমন দু'চারটি ঘটনা আপনাদের জানাবার ইচ্ছা আছে। যাতে নাকি বিশেষ করে সমাজ-বিজ্ঞানীদের পক্ষে মধ্যেকার সময়ের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করে নেওয়ার পক্ষে সহজ হয়। এই সব ঘটনা বলার আগে সাঁওতালি চিন্তাধারার মধ্যে যৌন-বোধটা কিরূপ ভাবে ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষেত্রে এবং সমাজের চক্ষে কাজ করে, সে সম্বন্ধে একটু বলা দরকার। বিষয়টা আমাদের কাছে, হিন্দু সমাজের উপরের স্তরে (সর্বোচ্চ নয়), বলা যায় মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে যতটা স্পর্শপ্রবণ, সাঁওতালদের কাছে তা নয়। এই বিষয়ে সপ্তম অধ্যায়ে খানিকটা

আভাস দিয়েছি ওদের রক্ষণশীল প্রথা ছাড়া অন্যান্য প্রথায় বিবাহ উপলক্ষে জুটি নির্বাচনের ব্যাপারে।

এই ব্যাপারে আর একটি কথা বলে রাখি। ওদের ছেলেদের ব্যাপারে সাঁওতাল মেয়ে ছাড়া অন্য জাতির মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়; কিন্তু সাঁওতালি মেয়েদের বেলায় সুযোগ নিজ জাতি ছাড়া চারপাশের অন্যান্য সমাজে বিস্তৃত। এই বিস্তৃতি সাঁওতাল সমাজ পছন্দ করে না, আপত্তি করে এবং এমন ঘটনা ঘটলে এক দু'বার জরিমানা করে এবং তাতে-ও না সামলে নিলে সমাজ থেকে বহিষ্কার করে। এইটাই নিয়ম। কিন্তু একটি যুবতী মেয়ে যদি তার উঠতি বয়স থেকে তার যৌনজুটি ঠিক করে নেয় এবং সেটা যদি মেয়ের স্ব-ঘরের হয় অর্থাৎ সমাজ-চল্ হয় তাহলে যুবতীর অভিভাবকরা তাকে বাধা দেয় না, জানতে পারলেও। এমনকি তাদের দৈহিক মিলন ঘটেছে সেকথা জানতে পারলে হয়তো মা মেয়েকে একটু সাবধান করে দেয়, কিন্তু জোর করে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে না। এই মেয়ে যদি আইবুড়ো হয় তাহলে সে নিজেই সাবধানে চলে; অন্তত আঠারো-কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত এদের প্রেমের কাহিনী জানা গেলেও সঙ্গমের প্রকাশ্য খবর পাওয়া যায় না। যদি ক্বচিৎ এরূপ মেয়ে অবৈধ কাম-ক্রিয়াজনিত অন্তঃসত্ত্বা হয় তাহলে মুক্ত করার ব্যবস্থা সমাজে বসেই হয়ে থাকে, সাধারণত সেকথা বাইরে কাউকে গ্রামের লোক জানায় না। কুড়ি থেকে তিরিশ এই বয়সের মেয়েরাই আইবুড়ো মেয়ের থেকে ছাড়ুই মেয়েদের অবৈধ যৌন সম্পর্কের ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। সাঁওতাল পুরুষরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে ঘর করছে নিজ গ্রামে, আবার অন্য গ্রামে আর এক সংসারের মেয়ের সঙ্গে রাত্রিবাস করে আসছে এমন ঘটনাও ওদের সমাজে চলে। তাদের এই উপরন্তু মিলনে একই পুরুষের দু'জায়গায় দুটো সংসার চলছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। এই ভিন্ গাঁয়ের বৌকে নিজের সংসারে এনে সাময়িক-ভাবে রাখার ঘটনাও আমাদের জানা। এতে সমাজ একটি কথাও বলে না, কোনো আপত্তি জানায় না। ওরা বলবে একটাকে তো পুরুষ বিয়ে করেছে, দ্বিতীয়াকে তো আর বিয়ে করেনি, তাকে 'রেখেছে'। এতে যদি ঐ মেয়ের সম্মতি থাকে আর তার অভিভাবক এবং সমাজ যদি আপত্তি না করে তবে আমাদের আপত্তি হবে কেন?

'ওকে রেখেছে' 'ওর সঙ্গে থাকছে' এই দুটি বাক্যাংশ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কোনো এক যুবকের কোনো একটি যুবতীকে পছন্দ হল। দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হল, বোঝাপড়া হল। বিচার-বিবেচনা করে যদি যুবতীটি ঐ যুবকের সঙ্গে থাকতে রাজি হয় তাহলে আর কারো অনুমতি নেবার দরকার করে না। এমনকি দুজনেই যদি আইবুড়ো হয় তাহলেও না। কোনো অনুষ্ঠান না করেই তারা দুজনে ঘর বাঁধতে পারে। এরূপ ঘটনা আজকালকার নয়। এই নিয়ম এদের সমাজে বহুদিন থেকে চলে আসছে। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। এখন থেকে প্রায় বিশ বছর আগে এখানের একটি গাঁয়ে গিয়ে শুনলাম সেদিন এমন একজন লোকের বিয়ে হবে যার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। আমি শুনে তো হতভম্ব। কারণ ঐ ব্যক্তির এক ছেলের বয়স কুড়ি-বাইশ হবে। ঐ ছেলেকে আমি চিনি এবং শীঘ্রই তার বিয়ে হবে, এমন আভাসও পেয়েছি। তবে কি ব্যাপার ?

ব্যাপারটা হচ্ছে, সেদিনের ঐ বিবাহযোগ্য ছেলের বাবা তার মাকে 'রেখেছিল'। কোনো বিবাহ-অনুষ্ঠান তখন তারা করেনি। এতো দিন সমাজে থেকেই তারা সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করেছে। আজ ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা যখন হতে চলেছে তখন ওদের সামাজিক নিয়ম-অনুযায়ী আগে বাপ-মার বিয়ে হতে হবে, নইলে ছেলের বিবাহ-অনুষ্ঠান হতে পারবে না। তাই বাপ-মার বিয়ের ব্যবস্থা।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সাঁওতাল-সমাজ নিজেদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে মেলামেশায় ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিলেও সাঁওতাল-সমাজের বাইরে অন্য পুরুষের সঙ্গে তাদের মেয়েদের মেলামেশার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। তাদের সমাজের মেয়েরা কি হিন্দু কি মুসলমান, কোনো পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করলে তা বরদাস্ত করে না, যৌন সম্পর্ক হলে তো নয়ই। কিন্তু এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও ভিন্‌জাতির পুরুষের সঙ্গে মেশা-মেশা করা থেকে নিজেদের মেয়েদের আয়ত্তে রাখতে পারছে না। ইদানীং আইবুড়ো মেয়েরাও এই পথে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। গোপনে এইসব মেয়েরা বিশেষ করে ছাড়ুই মেয়েরা ভিন্‌জাতির পুরুষদের দেহ দান করে উপরি রোজগারের পথে দিন-দিন এগিয়েই

চলেছে। মাঝে-মাঝে কোনো-কোনো গ্রামীন-সমাজ এদের বিচারের ডাক দিচ্ছে বটে কিন্তু খুব বেশি সুফল ফলছে না। লোকসানটা দুদিকেই ঘটছে।

যেমন বিচারে মেয়েটি দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে গ্রাম থেকে বহিষ্কারের আদেশ সমাজ দিচ্ছে; অভিভাবক মেয়েকে হারাচ্ছে। সেই মেয়ে গিয়ে ভিড়ছে শহরে বা শহরের উপকণ্ঠের পেশাদারী দেহ-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। এ সম্বন্ধে আমি আগেই উল্লেখ করেছি। এই নিয়ে একটা গ্রাম দু'ভাগে ভাগ হয়ে যেতেও দেখেছি। এক দল এরূপ মেয়েদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। এতে এদের নগদ লাভ কিছু টাকা মাঝে-মাঝে মেয়ের দৌলতে ঘরে আসছে। অন্য দল নিজেদের সমাজের নৈতিক দিকটা বজায় রাখার জন্য অন্য দলের সঙ্গে মেলা-মেশার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে নিচ্ছে। আমাদের ধারে-কাছে এমন গ্রাম আজ আছে যেখানের মেয়েরা যথেষ্ট বড়ো হয়েছে, বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের বর জুটছে না। কেন না, এই গ্রামের এতো দুর্নাম রটেছে যে, বয়স্থা মেয়ে মানেই তারা নষ্ট, বাবুদের দ্বারা পুষ্ট। ভিন্‌গাঁয়ের ছেলেরা তাদের নিতে চায় না।"

এরূপ একটি গ্রামের খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে, অনধিক দু'শো জনসংখ্যার ঐ গ্রামে আটটি ছাড়ুই মেয়ে আছে। এদের সবগুলিই অবশ্য মার্কামারা ভ্রষ্টা নয়, তবে অন্ততপক্ষে চারটি তো বটেই। অন্যগুলি সাঙা করতে চায়, কিন্তু তাদের বর জুটছে না। সমাজ-কর্মীরা মনে করেন, সৎভাবে যদি তাদের ভাত-কাপড়ের বন্দোবস্ত করানো যায় তাহলে হয়তো এদের বাঁচানো যেতে পারে। কিন্তু এরূপ ভাঙা বাঁধ ভরাট করা অতি দুরূহ কাজ, তার জন্য পূর্ণ-প্রস্তুতি না থাকলে হয়তো অঘটন ঘটতে পারে।

এরই কাছাকাছি আর একটি গ্রামে গত বছরে একটি অনূঢ়া যুবতীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সে কিছু দিন বেশ্যা-বৃত্তি করে ভালো ভালো শাড়ি, জামা ইত্যাদি পরে ঘোরাঘুরি করল, সকাল-সন্ধ্যায় যাতায়াতের পথে দেখতাম মাঝে-মাঝে। তার মা একদিন এসে কাঁদা-কাটা করে জানাল, মেয়েটাকে কতদিন হল সিউড়ী নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে, কেমন আছে ভালো-মন্দ কিছুই খবর পাচ্ছে

না। খবরটা কোনো রকমে তাকে জেনে দিতে পারি কিনা।

সেই মেয়ে যথা সময়ে ফিরেছে; তবে গ্রামে নয়। কিছু দিন পরে আবার স্বপথে যাতায়াত করছে; মা তার জন্য কোনো সুব্যবস্থা করতে পারেনি। একবার তাকে রোগে ধরল, তার 'বাবু'ই নাকি ওষুধ-পত্রাদির ব্যবস্থা করে তাকে ভালো করেছে। এই সব মেয়েরা সমাজ-বহিষ্কৃত হলেও তাদের রোজগারের পয়সার কিছুকিছু ভাগ মাকে বা ভাই-বোনদের দিয়ে থাকে, যাতে গরীবের সংসারে ক্ষুধার অন্ন জোগাতে মাকে সাহায্য করে। পাঠকের মনে হতে পারে এদের পরিণতি কি? ভবিষ্যৎ কি? আমিও জানি না। আগেই বলেছি গোলাপ পাগ্‌লি আখ্যা নিয়ে মরে বেঁচেছে। তবে সবাই গোলাপের মতো মন্দ-ভাগ্য নিয়ে আসেনি নিশ্চয়। উপরোক্ত ঐ মেয়েটিকে একদিন হঠাৎ দেখলাম পথে প্যারাম্বুলেটারে একটি শিশুকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। সুন্দর পোষাকে সে সুসজ্জিত। তাকে দেখে একটু আশ্বস্তই হলাম। সে কিন্তু লজ্জায় না ভয়ে জানি না, মুখটা নীচু করে নিল, আর তুলল না। আমি তাকে না চেনার ভান করে পেরিয়ে এলাম।

খুব হালের খবর, ঐ মেয়ের দিদি কিছু দিন হল স্বামীর ঘর থেকে পালিয়ে এসে মায়ের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। শুনলাম নাকি শীঘ্রই তার বিচার হবে, তার স্বামীর গ্রামে বসে। উভয় পক্ষের সর্দাররা মিলে বিচার করবে। জানি না ঠিক কয় কলসি 'হণ্ডি' কোন্ পক্ষ খরচ করবে। এই মেয়ের খবর আমি যতদূর জানি, সে বেশ বুদ্ধিমতী এবং চতুরা। তার ছোটো বোনকে সেই প্রথমে আশ্রয় এবং প্রশ্রয় দিয়েছিল; বলা যায় বেশ্যা-বৃত্তিতে নিয়োগ করেছিল। সে যে ধোয়া তুলসীপাতা নয় সে কথা বহুজন-বিদিত। যদি বিচারে সে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে শুধু হাতে তার অভিভাবককে ঘরে ফিরিয়ে নিতে হবে, অর্থাৎ গাঁয়ে আর একটি ছাড়ুই মেয়ে বাড়বে। বর্তমানে তিনটি আছে, তাদের সঙ্গে এইটিও যুক্ত হবে। এ মেয়ে ছাড়ুই হবে বলেই আমার বিশ্বাস। গ্রামে আরো আছে একজন বিধবা ও একজন বয়স্থা অনূঢ়া ও একটি প্রথম অপরাধিনী, যার মা-বাবা প্রচুর টাকা সমাজের কাছে জরিমানা দিয়ে মেয়েকে বহিষ্কারের হাত থেকে রক্ষা করেছে। কোনো রকমে ঐ খুঁতে মেয়েকে পাত্রস্থ করার জন্য স্বামী-স্ত্রী ছুটোছুটি করছে বটে কিন্তু ঐ মেয়েকে বৌ করে ঘরে তুলতে

ধারে-কাছের কোনো গ্রামের ছেলে রাজি হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। মনে হয় এ মেয়েকে কুপথ থেকে ফিরিয়ে সুপথে আনতে অতো সহজে পারবে না। নিজের থেকে ধাক্কা খেয়ে যদি ফেরে তবেই তা সম্ভব! আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত তাই-ই হবে।

এই গ্রামের আর একটি ঘটনা বলে শেষ করব। এই গ্রামের এক সম্পন্ন চাষীর বাড়ি, উপযুক্ত ছেলে-মেয়ে, বৌ, নাতী-নাতনী নিয়ে জম-জমাট সংসার। ছেলেরা কেউ চাষ, কেউ বা চাকরি করে। কর্তা-গিন্নী এখনো বর্তমান। এই বাড়িরই এক সুন্দরী মেয়ে একটি মাত্র কন্যাকে কোলে নিয়ে এখন থেকে আট নয় বছর আগে স্বামীর ঘর ত্যাগ করেছিল। তার সেই কন্যার বয়স এখন ন-দশ বছর হবে। এখানের এই সাঁওতাল সমাজে এই স্ত্রীলোকটির মতো সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্না ব্যক্তি নেই বলেই মনে হয়। স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসার পর সে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। অবশ্য গ্রাম ছেড়ে কোথাও সে রাত্রিবাস নাকি করেনি। তার বাবার দশ খানা গ্রামে নাম-ডাক আছে। এই তল্লাটের প্রায় সব গ্রামেই তার আত্মীয় কুটুম্ব আছে। কাজেই তার গতিবিধি আটকায় কে। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক তার বিরুদ্ধে কেউ কোনোদিন নালিশ করেনি। কিছু দিন আগে শুনলাম ঐ মেয়ে তারই গ্রামের এক বাড়িতে প্রায়ই অভিসারে যায়—রাত্রে একাকী। পুরুষটি কৃতদার, কিন্তু তার স্ত্রী অনেক দিন হল স্বামী-ঘর ত্যাগ করে চলে গেছে। তাদের কোনো সন্তান নেই। ঐ ব্যক্তি কিছুদিন থেকে মা-বাবা, ভাইদের থেকে ভিন্ন হয়ে একাকী বাস করছে একটি ছোট্ট ঘর সম্বল করে। শোনা যাচ্ছে দুই ছাড়ুই এক হবার কথা। সমাজে এখন সবাই জানে এ সম্ভাবনার কথা কিন্তু মুখ ফুটে এখনো কোনো পক্ষই কিছু বলছে না; অর্থাৎ এতে সমাজের কোনো আপত্তি নেই। এর কারণ আমি আগেই বলেছি, যদি নিজ জাতির মধ্যে স্বঘরের স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে সমাজ চুপ করে থেকে লক্ষ্য রাখে শেষটা কি দাঁড়ায় দেখার জন্য। এই দুজন যদি বাসা বাঁধে তাহলে অবশ্য সমাজের পাওনাটা না চাইতেই মিলে যাবে। আর যদি কোনো অঘটন ঘটিয়ে আবার তারা দুজনে পৃথক হয়ে যায় তাহলেও সমাজ তা মেনে নেবে, তার কোনো শাস্তির বিধান নেই।

তা হলে প্রশ্ন ওঠে, সাঁওতাল মেয়েদের যৌন-ক্ষুধা মেটাবার এতদূর

ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও তারা সমাজের গণ্ডী ভেঙে 'দিকু'দের দিকে এতো এগোচ্ছে কেন, সমাজের ঘোর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও? এবং সমাজের চক্ষে এরূপ ঘটনা আসা সত্ত্বেও সঙ্গে-সঙ্গে তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন?

সীমিত পরিবেশে নানা ঘটনা ও পরিস্থিতি পরিদৃষ্টে আমার যে ধারণা হয়েছে সেইটুকুই এখানে জানাচ্ছি। উপরোক্ত প্রশ্নগুলির তো বটেই ঐরূপ আরো অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে বলে আমার ধারণা।

প্রথমত বলা যায়, কাম-প্রবৃত্তি যদি উদ্দীপ্ত হয় এবং তা মেটাবার জন্য যতই স্বাধীনতা তাকে দেওয়া যাক্ সমাজ তার যে একটি গণ্ডী টেনে দিয়েছে তার বাইরে গেলেই সেটা অবৈধ বলে গণ্য হবে। যেখানে সাঁওতাল হলে পরপুরুষের সঙ্গ-লাভে দোষ নেই, যত দোষ হল অ-সাঁওতাল হলেই। উদ্দীপ্ত কাম গর্জে উঠে বলবে, কেন? আমি তো বিশ্বজনীন, তবে এতো বাছ-বিচার মানব কেন? যুগে যুগে বিশ্ব জুড়ে বাঁধ ভাঙার খেলা চলছে, তবে সাঁওতাল বলে কি আইন ভিন্ন হবে?

এই বিশ্ব-জোড়া খেলার মাতনকে রোধ করার জন্যই সর্ব দেশে সর্ব যুগে সমাজ-কর্তারা মাথা ঘামিয়েছে, নানা আইন-কানুন বিধিবদ্ধ করেছে।

সাঁওতাল যুবতীরা দিকুদের দিকে তখনই ঝুঁকেছে যখন থেকে দিকুদের সঙ্গে তাদের মেলামেশার সুযোগ ঘটেছে এবং দিকুরা যখন ওদের দিকে হাত বাড়িয়েছে তখন কাম-পাত্র নির্বাচনের স্বাধীনতার ঐতিহ্য নিয়ে ওদের মন সাড়া দিয়েছে। মনের সাড়া মিললে তখন একমাত্র বাধা থাকল সমাজের গণ্ডী ভাঙার ঝুঁকি। সে ঝুঁকি সে নিয়েছে; তার পক্ষে এগিয়ে যাওয়ার আকর্ষণ বেড়েছে। এই জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে অর্থ। পরিমাণ তার যাই হোক, যেহেতু অর্থাভাবের জন্য সে এই অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়নি, তাই সেই অর্থের মূল্য অর্থনৈতিক দিকের চেয়ে মানসিক মূল্য পেয়েছে প্রচুর। এর প্রমাণ পাওয়া যায় এরূপ অর্থের ব্যয় তারা কিভাবে আগে করত এবং এখনো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে করে, তার বিচার থেকে। অতএব বলা যায় শুরুতে অর্থনৈতিক দিকটা ছিল গৌণ, মনোবৈজ্ঞানিক মূল্যটাই ছিল মুখ্য। ক্রমশ অল্প বয়সে অধিক রোজগারটাই এদের কাছে দেখা দিলেও সেই পয়সা জমিয়ে ওরা ভবিষ্যতের পুঁজি করেছে এমন তো

একটাও দেখলাম না। এইরূপ রোজগারের পয়সায় বেশি দাম দিয়ে ওরা রংচঙে শাড়ি-ব্লাউজ ইত্যাদি অঙ্গাবরণ কেনে। বড়ো জোর কেনে দু-একটি রূপোর গয়না এবং গিল্‌টি সোনার নাকছাবি, কানের ফুল।

গোপন পথে যে পয়সা আসে তার সন্ধান বাড়ির পুরুষরা রেখেও রাখে না। কিন্তু ঐ দিকুদের কাছ থেকেই আবার খোলা পথে যে পয়সা আসে তার উপর তো অনেকেই নির্ভরশীল। অর্থাৎ এই দিকুদের উপরই অনেক সাঁওতাল পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্ভর করে। অতএব দিকুরা যেখানে অন্নদাতা, তা শ্রমের বিনিময়ে হলেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তা কি প্রকাশ্যে বলার মতো সাহস কারো আছে? তাছাড়া দোষ ধরলে সে দোষ তো শুধু দিকুর নয়, সেজন্য তো ঘরের লোকও দায়ী। অতএব, এজন্য বন্ধ-দ্বার গৃহে অনুযোগ অভিযোগ বাকবিতণ্ডা মারামারি সবই চলতে পারে, কিন্তু প্রকাশ্যে ঘরের লোককে ছাড়ুই করাই একমাত্র পথ থাকে।

এতক্ষণ আমি যা যা বললাম সেগুলি প্রায় সবই সমাজ-বিজ্ঞানের বিষয় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এ-সবের মধ্যে একটা মনোবৈজ্ঞানিক দিকও আছে। এই দিক থেকে আমার বক্তব্য এবারে পেশ করছি।

এদের সমাজ-জীবন ও শাসন-ব্যবস্থা বুঝতে হলে যৌন-জীবন সম্বন্ধে এদের যে ধ্যান-ধারণা সে সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা অবশ্যই দরকার, একথা আমার পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই বুঝেছেন। মনোবিজ্ঞানীর চোখ এবং মন নিয়ে আমি যেসব ঘটনা পর্যবেক্ষণ ক'রে, বহুদিন ধরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, ভাষায় তার রূপ দেওয়া শুধু কঠিন নয়, প্রায় অসম্ভব। তবুও এরই মধ্যে উদাহরণস্বরূপ এবং আমার অবক্তব্য অভিজ্ঞতার প্রতিনিধি হিসাবে দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করব।

এদের যৌনবোধ এবং কর্মজীবনের প্রকৃতি আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের থেকে বেশ কিছুটা যে ভিন্ন সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে সমাজনৈতিক ও ব্যক্তিনৈতিক মনটাও ওদের আমাদের থেকে আলাদা, একথাটাও স্মরণ রাখতে হবে। কিন্তু এই নীতিবোধটার প্রকৃতি কিরূপ? এবং সেটা হলই বা কিভাবে? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর পেলে আমার বক্তব্যটিও পরিষ্কার হবে।

আমরা জানি আমাদের জীবনে নীতিবোধটা আসে শিশুকালেই,

যখন মাতা-পিতার কাছ থেকে আমরা ভালো-মন্দ শিক্ষা লাভ করি। এই শিক্ষা শুরু হয় মোটামুটি দেড় দুই বছর বয়স থেকে। এই সময়েই উপ্ত হয় মানব জীবনে নীতিবোধের বীজ—'অধিশাস্তার' (Super-Ego) গোড়াপত্তন। আমার মনে হয়েছে সাঁওতালদের জীবনে এই গোড়া-পত্তনেই পার্থক্য আছে। সাঁওতাল সমাজ প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষকে যেমন নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীনতা দিয়ে থাকে, শিশুদের বেলাতেও মাতা-পিতারা সেই স্বাধীনতা দেয়। অর্থাৎ শিশু-পালন পদ্ধতিটাই আমাদের তুলনায় এদের ভিন্ন। যে জন্য কাম-জীবনটাই এদের ভিন্ন রকমের। অর্থাৎ কাম বা যৌন জীবনের প্রতি বোধ বা বিচার আমাদের থেকে এদের আলাদা। আমাদের অধিশাস্তার মানের সঙ্গে এদের অধিশাস্তার মান মিলবে না।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি : আপনি ভাবতে পারেন যে, তিন-চার বছরের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে গ্রামের মধ্যের রাস্তায় ('কুলিতে') বসে পরস্পরের লিঙ্গ নিয়ে মশ্‌গুল হয়ে খেলছে, পাশে তিন চার হাত মাত্র দূরে দুই বাড়ির লোক দাঁড়িয়ে গল্প করছে! প্রথম যেদিন এ দৃশ্য দেখি, প্রথমেই মনে হয়েছিল হয়তো পূর্ণবয়স্ক লোকেরা শিশুদের খেলাটা লক্ষ্য করেনি। কিন্তু পরে তাদের জিজ্ঞাসা করে জেনেছি "ও তো শিশু; করবেই তো! আমরা কি কি করব ?"

আর আমরা ? এরূপ ক্ষেত্রে কি করি ?

আরো দু'টি শিশুর খবর দিচ্ছি। একটির বয়স আট, অন্যটির ছয় হবে। সন্ধে হয় হয়, এমন সময় বৃদ্ধা দিদিমা বাড়ি ফিরল। বুড়ো দাদু এখনো ফেরেনি। একটু দেরি হবে আজ ফিরতে—বৃদ্ধা বলল। অর্থাৎ ততক্ষণে বুড়ো হারাম হয়তো মাতালশালে। বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলাম, গোরু-বাছুর, শুয়োর, মুরগি, ছাগল এ সবের দেখাশোনা করে কে ? মেয়ে কি ? উত্তরে বৃদ্ধা বলল না, মেয়েও তো কাজে যায়, নইলে খাবে কি ? ওগুলো অর্থাৎ জন্তুগুলো দেখে ওই 'লাতি' দুটো, অর্থাৎ মেয়ের ছেলেরা। বৃদ্ধার এই মেয়ে অনেকদিন থেকে ছাডুই-এর জীবন কাটাচ্ছে। পাঁচ ছ-বছর ধরে সাঙা করেনি। ছেলে দুটির এখনো বাগালিতে ঢোকার বয়স হয়নি, নইলে একটি অন্তত ঢুকে পড়ত। তখন

আর মাকে বা দিদিমাকে তার জন্য ভাবতে হবে না। দ্বিতীয়টি একাই তখন সংসারে সারাদিনের ভার নেবে।—এখন যুবতী মেয়েটি ছেলে দুটিকে নিয়ে একটি ছোট্ট ঘরে বাস করে। বুড়ো-বুড়ি থাকে অন্য একটি ঘরে। ছেলে দুটি অন্য ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিজেদের গোরু-ছাগল নিয়ে মাঠে চলে যায়। নির্দিষ্ট সময়ে ঘরে ফেরে, অর্থাৎ গোরু-বাছুরকে ঘরে পৌঁছে বাকি সময়টায় মারবেল, ডাণ্ডা-গুলি ইত্যাদি খেলে কাটিয়ে দেয়।

শিশুর জন্ম থেকে যদি ধরা যায় তাহলে দেখব সেখানেও ওরা আমাদের থেকে অনেক আলাদা। জন্মের পর থেকে শিশু যতদিন বুকের দুধ খাবে (সাধারণত অন্য আর একটি সন্তান মার পেটে আসার নোটিশ না পাওয়া পর্যন্ত) ততদিন শিশুকে মা কাছছাড়া করবে না। যদি দৈবাৎ কেউ করে তাহলে তখন মার নিন্দা হবে। এরূপ কাজ সমাজ বরদাস্ত করে না। তাই দেখা যায় 'মুখ-কাম' স্তরটায় এরা শিশুর পরিচর্যায় বিশেষ মনোযোগী থাকে। 'পায়ু'স্তরেও অনেকটাই ঐ চেষ্টা বজায় রাখে, কিন্তু 'লিঙ্গ-কাম' স্তরে শিশু প্রায় স্বাধীন, তখন মার কোল ছেড়ে দিদির সঙ্গই হয় তার প্রধান অবলম্বন। আরো একটু বড়ো হলে, অর্থাৎ ছ-সাত বছর বয়স হয়ে গেলে তখন সে মুক্ত সহচর, উলঙ্গ দিগম্বর।

এইরূপ প্রকৃতির প্রাঙ্গণে উলঙ্গ আবহাওয়ায় যারা মানুষ হচ্ছে, ছেলে-মেয়ে উভয়েই, তাদের সংসারী হবার সময় হলে ধরা-বাঁধা নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে বেশিদিন থাকবে কি করে? এইদিক থেকে বিবেচনা করলে এদের যে বিচিত্র রকমের বিবাহের নিয়ম-পদ্ধতি আছে, সেগুলি মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। কিন্তু এদের আজকের সমাজের মেয়েরা যে ভাঙন ধরিয়েছে সেটা 'ওরা'-'আমরা' এই ভেদাভেদ প্রকটভাবে আছে বলেই এতো সমস্যাপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা আমাদের আলাদা না করে পারছে না। ওরা ওদের মেয়েরা আমাদের পাঞ্জার মধ্যে আসতে পারে, কিন্তু আমাদেরকে ওরা ওদের পাঞ্জার মধ্যে, ওদের নিয়ম-কানুনের বাঁধন দিয়ে বাঁধতে পারে না। এইটাই আজকে সাঁওতাল সমাজ-কর্তাদের কাছে বড়ো সমস্যা। মেয়েরা পুরুষদের এই দুর্বলতার কথা জেনে ফেলেছে, তাই আজ তারা একটু সুযোগ পেলেই সমাজের চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করতে ইতস্তত করছে না।

সমাজ-শাসকদের হাতে আর একটি হাতিয়ার, মনে হয় এইটাই শেষ,

আছে। ক্ষেত্র-বিশেষে হেথা-হোথা তার প্রয়োগ হচ্ছে। এটি হচ্ছে বোঙাআর ভয়। ডাইনী, ভূত প্রেত ইত্যাদি অশরীরি আত্মার ভয় এদের ধর্ম ও সমাজ-জীবনে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এদের ধর্মানুষ্ঠানের বিবরণ দেবার সময় ঐ বিষয়ে কিছু আলোকসম্পাত করার চেষ্টা আমি করেছি। কিন্তু আমার মনে হয় এই হাতিয়ারও ভোঁতা অস্ত্র বলে প্রমাণিত হতে বেশি দেরি হবে না। সাঁওতাল-সমাজকে আবার নিজস্বতায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নতুন পথের সন্ধান করতে হবে।

ওদের সমাজের ভাঙনকে রোধ করতে হলে যে নতুন পথের কথা আমার মনে হয়েছে সে সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে আমার এই প্রবন্ধ শেষ করব। আমি মনে করি শুধু সাঁওতাল বা শুধু 'দিকু' অর্থাৎ 'ওরা' 'আমরা' আলাদা দুটো সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সমাজ বা দল, এই চিন্তা আপাতত ত্যাগ করতে হবে, উভয় দলকেই। আজকে সাঁওতাল-সমাজে যে ভাঙন সাঁওতালি মেয়েরা এনেছে এবং আনছে, যে-ভাঙনকে তাদের সমাজকর্তারা সামলাতে পারছে না, তার প্রতিরোধ-ব্যবস্থা অতি সত্বর করা দরকার; এবং সেটা করা সম্ভব, যদি উভয় দল মিলে একটি মিশ্রিত সমাজদল সৃষ্টি ক'রে সম্মিলিতভাবে সমাজ-শাসন-পদ্ধতির প্রবর্তন করা যায়। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা দরকার। আপাতত এই ব্যাপারের পণ্ডিতদের কাছে আমি সবিনয়ে আমার বক্তব্য পেশ করে আজ বিদায় নিচ্ছি।